সিঙ্গুর :
শিল্পের নীচে অন্ধকার

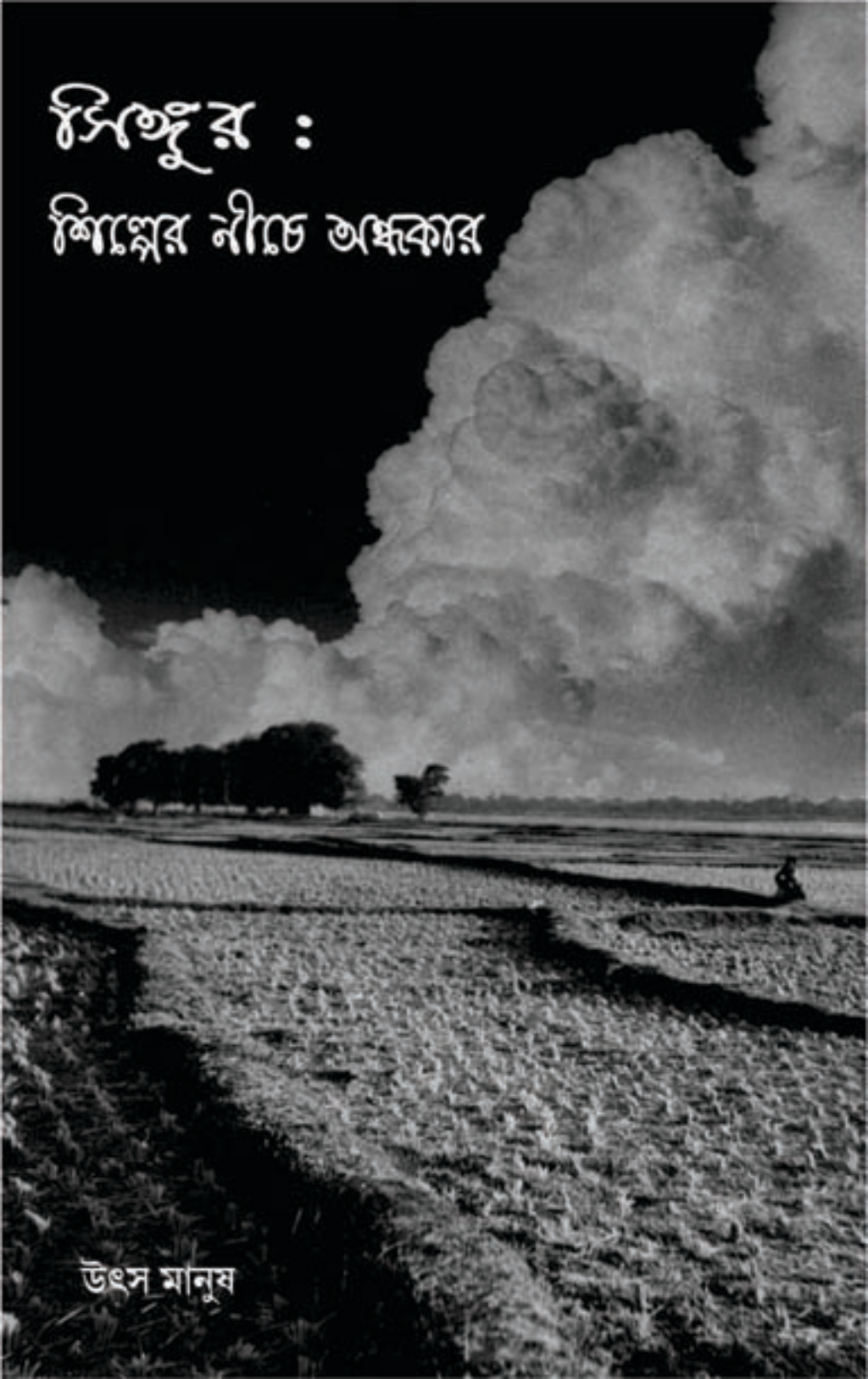

উৎস মানুষ

সিঙ্গুর শিল্পের নীচে অন্ধকার

উৎস মানুষ প্রকাশন

Singur : Shilper Niche Andhokar
An Utsa Manush Publication

প্রকাশক ব(ণ ভট্টাচার্য
সচিব, উৎস মানুষ
বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক। কলকাতা ৭০০০৬৪

প্রকাশ নভেম্বর ২০০৬

মুদ্রক নবকুমার দত্ত
শৈলী
৪এ মানিকতলা মেন রোড
কলকাতা ৭০০০৫৪

প্রচ্ছদ ফটো সুনীল জানা

ভেতরের ফটো ‘ফোকাস’-এর সদস্যরা (হিন্দমোটর)

সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ISBN 81-86371-29-9

দাম ১০ টাকা

কেমন যেন চেনা চেনা গল্প মনে হয়।

সে-ই ১৬৯০-এর কথা। বিদেশি বানিয়া জব চার্নক কুঠি বসানোর খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে জাহাজ ভেড়ালেন গঙ্গাপারের সুতানুটিতে, এখন যেখানে হাটখোলা। পুবে ঘন জঙ্গল আর জলা। দ(েণ গোবিন্দপুর। মাঝখানে কলকাতা। বিদেশি সাহেব বললেন — এই তিনটে গাঁ আমার পছন্দ, এগুলো আমার চাই। ব্যস্, কেনা হয়ে গেল, কোম্পানির ফ্ল্যাগ উড়ল সুতানুটিতে। শু(হল ঔপনিবেশিক বাণিজ্য। ... তিনশ' ষোল বছর পরে ২০০৬ সালে দেশি বানিয়া রতন টাটা গাড়ি-কারখানা বসানোর খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে সিঙ্গুর এলেন। একপাশে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে, অন্য পাশে বিস্তীর্ণ সবুজ-সোনালী ধান(েত। দেশি সাহেব বললেন — এ জায়গাটা আমার পছন্দ, এই হাজার একর আমার চাই। মন্ত্রী-সান্ত্রী-নেতারা হৃষ্ট চিত্তে মাথা নাড়লেন — বেশ তো, বেশ তো, নিন না। ব্যস, কেনাবেচা সারা। শু(হচ্ছে শিল্প-মৃগয়ার অভিযান।

একি একই রকম ঔপনিবেশিক কাহিনী নয়?

আমাদের এই রাজ্যে অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে ভয় হয়। কবে কখন গ্রামবাংলার কোথায় এসে দাঁড়াবে টাটা, সালেম, আম্বানিরা, এসে আঙুল তুলে বলবে — আমার ওই জমিটা চাই, ওই ঝর্না নদীটা চাই, ওই সুনীল আকাশ মলয় বাতাস চাই, ফুল প্রজাপতি চাই, তখন কী হবে?

কী হচ্ছে এসব, কেনই বা হচ্ছে? আমরা সরকারি বিজ্ঞাপনে দেখছি, মন্ত্রীর বিবৃতিতে শুনছি — বি(োয়নের ছকে পরিচিত স্লোগান 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ।' কিন্তু কেমন ভবিষ্যৎ? ভরা-ফসলি কৃষির শবদেহের ওপর ইমারত তুলে যে শিল্পবিকাশ, তা কোন মানবিক ভবিষ্যৎ রচনা করবে?

উন্নয়ন চাই তো বটেই, বি(ের কোন দেশ না উন্নত হতে চায়! তা বলে উন্নয়ন কি শুধু শিল্প-কারখানার? জীবিকা, স্বাস্থ্য, শি(া, সংস্কৃতি, প্রকৃতির উন্নয়ন নয়? ঘোষিত 'উন্নয়নে'র অন্য পিঠে শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানব-জীবনের হত্যাকাহিনী রক্ত(া(রে লেখা থাকবে, সেটা কি কেউ চায়? মজা হল, সিঙ্গুর-কে সামনে নিয়ে যাদের জন্য উন্নয়ন বলা হচ্ছে, তারাই বলছে — এ উন্নয়ন চাই না। পারলে সার্বিক উন্নয়ন কর, না হলে নয়। আমাদের বেঁচে থাকতে দাও।

ওদের কথা কি কেউ শুনছে? চোখের সামনে তিন-ফসলি চার-ফসলি জমি দেখেও বামদলের শাসনকর্তারা ৪০ বছর আগেকার সরকারি কৃষি-নথির রেকর্ড থেকে অনায়াসে বলে দিচ্ছেন—সিঙ্গুরের বারো আনা জমি একফসলি বা অনাবাদী। চমৎকার! একটা নির্জলা মিথ্যাকে 'সত্য' বলে প্রচার করা হচ্ছে। কিছুই কি করার নেই আমাদের? শুধুই (োভের আগুন বুকে চাপা দিয়ে রাখতে হবে?

ভালো করে জানতে হবে, বুঝতে হবে সিঙ্গুরের মানুষ কী চাইছে। পরস্পরের বেদনাকে স্পর্শ করতে না পারলে আমরা আর মানুষ কিসে!

২০ নভেম্বর ২০০৬

উৎস মানুষ

জানতে গিয়েছি
বুঝতে চেয়েছি

শর্মিষ্ঠা রায়

গত কয়েক মাসে খবরের কাগজের পাতায়, দৃশ্যমাধ্যমে, সিঙ্গুরের সরব উপস্থিতি। আবার মূলধারার কিছু 'বড় কাগজ' আশ্চর্য নীরব। শুনছি কৃষকরা স্লোগান দিচ্ছে 'জান দেব, জমি দেব না'। প্রত্যুত্তরে মুখ্যমন্ত্রীর উচ্ছ্বসিত আশ্বাস। এরই মধ্যে জানা গেল, টি ভি-তে দেখা গেল, ২৫ সেপ্টেম্বর তৃতীয়ার মধ্যরাতে চারপাশ ব্ল্যাক আউট করে সিঙ্গুরে সরকারি লেঠেল বাহিনীর পৈশাচিক তাণ্ডব, মহিলাদের নীলতাহানি — আমাদের বোধের মূল ধরে নাড়িয়ে দিয়েছিল। একটি স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠনের তরফ থেকে আমরা ছুটে যাই সিঙ্গুর, আহতদের পাশে চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে। দলে ছিলাম দু'জন চিকিৎসক, কিছু সমাজকর্মী ও কিছু ছাত্রছাত্রী। সিঙ্গুরবাসীর সঙ্গে কথা বলে সেদিন যা জেনেছি যা বুঝেছি, তার ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

এ এক বড় অদ্ভুত সময়। সারা দুনিয়া সমস্বরে চিৎকার করছে কমিউনিজম মৃত, চিনের ইতিহাস-বইয়ের পাতা থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে মাও সে তুং-এর নাম, এমনি সময় মার্কস সাহেবের বঙ্গীয় 'ভক্তে'র দল যেভাবে কৃষিজীবী মানুষের জমি কেড়ে নেবার লড়াইয়ে নেমেছে, তাতে মার্কস বেঁচে থাকলে একথাই বলতেন যে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তাঁর 'পুঁজি' বই-এর প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশের ৩০ তম অধ্যায়ে 'শিল্পের ওপর কৃষিবিপ্-বের প্রতিক্রি(য়া' শীর্ষক অংশে তিনি বলে গেছেন কৃষিজমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদের এক কাহিনী। সেখানেও দখলচ্যুত এবং বাতাসে ভেসে বেড়ানো কৃষকদের বলিপ্রদত্ত করা হয়েছিল পরগাছা সুলভ দোকানদার শ্রেণীর কাছে এবং অলীক বাণিজ্যিক আর্থিক ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে।

২৭তম অধ্যায়ে আমরা দেখছি ফ্লেমিশ পশমশিল্পের দ্রুত উন্নতি এবং সেইসঙ্গে ইংল্যান্ডে পশমের মূল্যবৃদ্ধির কারণে কৃষি জমিকে মেষচারণ ভূমিতে পরিণত করার জন্য বহু কৃষককে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো কৃষিজমি থেকে। অকথ্য অত্যাচার করে, তাদের বসতবাড়ি পুড়িয়ে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

এরই সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে পরাধীন ভারতে সংঘটিত অসংখ্য বিদ্রোহের মত ১৮৭২-৭৩ সালে সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহের কথা। এই বিদ্রোহ কেবল জমিদার গোষ্ঠীর কৃষক শোষণের চক্র(ান্ত ব্যর্থ করেই (ান্ত হয়নি, কৃষিজমির দখল থেকে প্রজা উচ্ছেদের নিরঙ্কুশ অধিকার সম্বলিত বিভিন্ন আইন রদ করে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ করতে ইংরেজ শাসকদের বাধ্য করেছিল। যে বিদ্রোহের পটভূমিতে ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ সালে

(ইং ১৮৯৫ খ্রী.) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন জমিদার কর্তৃক প্রজা উচ্ছেদের এক ক(ণ দলিল — 'দুই বিঘা জমি'।

কৃষক উচ্ছেদের এ ইতিহাসের সত্যতা সি. ই. বাকল্যান্ড ও উইলিয়াম হান্টার সাহেব তাঁদের ইতিহাস রচনায় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও এস. ই. জেড (স্পেশাল ইকনমিক জোন)-এর (ে ত্র প্রস্তুত করতে যে রাজসূয় যজ্ঞ শু(হয়েছে, সেখানে রতন টাটাদের মত জমিদার বাহিনীর স্বার্থর(া করতে এ রাজ্যের শাসককুল ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকাই নিয়েছে।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (S E Z)

'এস. ই. জেড আইনে' পণ্য পরিষেবায় বিদেশি বাণিজ্যের বিকাশ ঘটানোকেই সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ ল(্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কতকগুলি অঞ্চলকে এখানে নির্দিষ্ট করা হয়, যেখানে শিল্পতিদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা নিয়মকানুন চালু করা হয়। শুল্ক, লাইসেন্সিং, রপ্তানিলব্ধ অর্থ আদায়, বা তা পাঁচ বছরের ব্লকের জন্য ১০০ শতাংশ আয়কর ছাড়, প্রায় বিনা পয়সায় জল-বিদ্যুতের সুবিধা দেওয়া হয়। বিনিময়ে লগ্নিকারীরা সবচেয়ে কম লগ্নি করে সবচেয়ে বেশি লাভ করতে যাতে পারেন, তার সব ব্যবস্থাই সরকার করে দেয়।

নতুন আইনে ১০০০ হেক্টর এলাকা নিয়ে সরকারি, বেসরকারি, যৌথ বা রাজ্য সরকারি সেক্টরে এস. ই. জেড স্থাপনের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এস. ই. জেডগুলিকে এক প্রায়-স্বনির্ভর এলাকা হতে হবে, যেখানে বাণিজ্যিক তথা বসবাসকারী অধিবাসীদের জন্য উচ্চমানের পরিকাঠামো থাকবে। এস. ই. জেডগুলোর নিজস্ব নিরাপত্তা, কার্যকলাপ চালানো ও র(ণাবে(ণ সংক্র(ান্ত বিধিব্যবস্থা এবং সং(ি-ষ্ট এস. ই. জেড-এর কমিশনারের হাতে পরিবেশ ও শ্রম সংক্র(ান্ত ছাড়পত্র দেওয়ার (মতা থাকতে হবে।

সাত মন তেল তো পুড়ল .... কর্মসংস্থানের কি হল?

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত পশ্চিমবঙ্গের ফলতাতেও ই. পি. জেড বদলে এস. ই. জেড তৈরি হয়েছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার পুঁজিবাদী পথে শিল্পায়ন উন্নয়নের রাস্তা বেছে নিয়ে রাজ্য জুড়ে আরও এস. ই. জেড তৈরির ল(্যে এগিয়ে চলেছে। ১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার উদার আর্থিক নীতি নেওয়ার পর থেকেই এ রাজ্যে বৃহৎ পুঁজি আসার শু(। সে আগমন আরও জোরদার হয়েছে ১৯৯৪ সালে রাজ্য সরকারও উদার শিল্পনীতি গ্রহণ করায়। যে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস নিয়ে এত ঢাকঢোল পেটানো হয় তার গল্পটা একটু শুনুন। এই শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫১৭০ কোটি টাকা। এই বিপুল বিনিয়োগ কর্মসংস্থানের প্রত্য(সুযোগ করেছে ৬০০ জনের মত, আর অনুসারী শিল্পে এ রাজ্যে ১৬,২৪৮ জন ও অন্য রাজ্যে ৫,৪০৯ জন।

এ ব্যাপারে বামফ্রন্টের বড় শরিক সি পি এমের রাজ্য কমিটির মুখপত্র 'মার্কসবাদী পথ'-এর নভেম্বর ২০০৩ সংখ্যায় শ্রী পি. কে দাস বলছেন —

''উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, ও বিদেশিকরণের নীতিতে কর্মসংস্থানও বাড়েনি। মোট চাকরিরত মানুষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ইতিমধ্যে বর্ধমান জেলায় স্থায়ী কাজ করেন

এমন এক ল(নব্বই হাজার শ্রমিক অবসর, স্বেচ্ছাবসর, মৃত্যু-ইত্যাদি কারণে বিদায় নিয়েছেন, যে পদ পূরণ করা হয়নি। মোটামুটি ৬০টি যে সংগঠিত শিল্প গড়ে উঠেছে, তার শ্রমিক সংখ্যা সম্মিলিত শ্রমিক সংখ্যার এক দশমাংশও নয়, অর্থাৎ ১৯০০০ নয়। স্থায়ী শ্রমিকের স্থান দ্রুত দখল করছে অত্যন্ত স্বল্প বেতনের ভিন রাজ্য থেকে আসা ১১ ঘণ্টা কাজ করা ঠিকা শ্রমিক। এই জেলায় যেসব লোহা ও ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে বেশি শ্রমিক কাজ করে এমন ২৩টি কারখানার ওপর সমী(ার ফল হলো যেখানে স্থায়ী শ্রমিক ১৮৪৩ জন, সেখানে ঠিকা শ্রমিক এর তিনগুণ, অর্থাৎ, ৫৪৭৪ জন। শ্রম আইন মানা হয় না অনেক (ে ত্রেই।''

সিঙ্গুরে হচ্ছেটা কি?

বিজ্ঞাপিত যে উন্নয়ন সিঙ্গুরে হতে চলেছে, তার চেহারাটা একবার দেখে নেওয়া যাক। জমি নেওয়া হবে — ৩০৩৯ বিঘা বা ৯৯৭ একর।

জমি হারাবেন ৫ হাজার কৃষক পরিবার।

(তিগ্রস্ত হবেন চাষী, (ে তমজুর, ছোট দোকানদারসহ সরাসরি ৫০ হাজার মানুষ।

কাজ পাওয়ার কথা ৮০০ জনের।

যদিও কতটা জমি কোন কাজে ব্যবহার, কত টাকা বিনিয়োগ, কত দামে সরকারের থেকে জমি নেওয়া — কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন বা ডি. পি. আর আজও পেশ করেনি টাটারা।

> ''ট্রেডের দ(ন পিতৃপিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূমিখণ্ড থেকে উৎখাত হচ্ছে পাঁচ-সাড়ে পাঁচ হাজার পরিবার, জীবিকা খোয়াচ্ছে মোটামুটি ২০০ নথিবদ্ধ ভাগচাষী ও ৪০০ জন নথিবহির্ভূত ভাগচাষী, ১৫০০ খেত মজদুর, ২০০ ভ্যানচালক, ৩০ থেকে ৪০ জন পাওয়ার টিলার চালক এবং ১০০ থেকে ১০০০ জন অন্য স্থান থেকে আসা খেত মজদুর যাদের বেশির ভাগই আদিবাসী রমণী। তা ছাড়াও রাজ্য হারাচ্ছে ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার টন ফসল।''
>
> সুনন্দ সান্যাল ।। দৈনিক স্টেট্সম্যান,
> ২৭ অক্টোবর, ২০০৬

সিঙ্গুরে জমির দাম কাঠা প্রতি ১৫ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। সরকার জমির মালিককে ১০ থেকে ১৩ হাজার টাকা দিচ্ছেন। এই হল (তিপূরণ। টাকাটা পাবেন জমির মালিক। তাও শোনা যাচ্ছে বিডিও অফিসে গিয়ে যারা চেক নিচ্ছেন, তাদের একটা অংশ আগেই জমি বেচে দিয়েছেন অন্য কারও কাছে, কেবল মিউটেশন হয়নি বলে তার সুযোগ নিয়ে টাটাকে জমি দেয়ার নাম করে চেক নিচ্ছেন পুরনো মালিক। এদের কী ব্যবস্থা সরকার করছেন, তা অবশ্য শোনা যায়নি। আর কৃষির সঙ্গে যুক্ত(যে অজস্র মানুষ, তাঁরা কোথায় যাবেন? তাঁরা যে জীবিকা হারাবেন, তাঁদের (তিপূরণ কে দেবে?

ভাগচাষী, খেতমজুর, তাদের পরিবার, সব্জি বিক্রে(তা, গ্রামের দোকানদারেরা, সার-কীটনাশক-ওষুধ-মাংস-ডিম-মাছ ব্যবসায়ীরা, ধানের আড়তদার, হিমঘর মালিক, মিল মালিক, মিল শ্রমিকরা, গো(ার গাড়ির মালিক, পরিবহন শ্রমিক, চালকল মালিক, ধানের কুঁড়ো সাফাইকারী, তুঁষ বিক্রে(তা, তুঁষের তেল উৎপাদন তেল বিক্রে(তারা?

এঁরা কোথায় যাবেন? কোথায় যাবেন এঁদের উৎপাদিত দ্রব্য যারা কেনেন? নাকি টাটারা সস্তায় মোটর গাড়ি তৈরি করতে শু(করলে সমাজে এঁদের আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না?

সরকারি মিথ্যা ভাষণ বনাম সিঙ্গুরের জ্বলন্ত বাস্তব

শাসক প(ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি(রা দৃশ্য মাধ্যমে (টিভি) বলেছেন, কেবল জমিতে ফসল ফলিয়ে নাকি একজন মানুষ আজকাল পেট চালাতে পারেন না। কৃষকনেতা বিনয় কোঙার বলেছেন — ''কৃষিতে আর লাভ হচ্ছে না, শুধু চাষ করে আর জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতিতেও এসেছে পরিবর্তন, তবে দেশের পরিবর্তনের সঙ্গে রাজ্যের পরিবর্তনের তফাৎ আছে। এ রাজ্যে কৃষির উপর নির্ভরতা বেশি। তা দূর হতে পারে যদি শিল্পায়ন হয়।''

এবারে আসুন সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়ার হারাধন সরকার কী বলছেন শুনি। এক বিঘা জমি চাষ করে ছ'জনের সংসার চালাচ্ছেন তিনি। আশি বস্তারও উপরে আলু হয়। ১৮ মণ ধান হয়। খাসের ভেড়ির একটি ক্লাবে ধানের কথা তুলতেই গুঞ্জন উঠল কৃষকদের মধ্যে। 'স্বর্ণ মাসুরি ধান। এ ধানে আমরা ময়লা দিই না।' তাতেই এত ফলন। উচ্চ ফলনশীল (high yielding) ধান হলে কত ফলত !

চিকিৎসা শিবিরে গায়ের ব্যথার ওষুধ নিতে এসেছেন ৭৫ বছর বয়সী সরস্বতী দাস। দেখলেই মাতঙ্গিনী হাজরার কথা মনে পড়ে। মেয়েদের নেতৃত্ব দিয়েছেন, পুলিশের লাঠির ঘায়ে পড়ে গিয়েছিলেন নর্দমায়। স্মিতভাষী বৃদ্ধা দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন 'জান দেব, তবু জমি দেব না।'

২৫ সেপ্টেম্বর পুলিশ ও র‍্যাফের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন আরতি খাঁড়া। এলাকায় পাওয়ার কাট করে চক্র(ব্যূহের মত ঘিরে ফেলে বাচ্চা-বুড়ো নির্বিশেষে মধ্যরাতে পিটিয়েছে পুলিশ। মদ্যপ অবস্থায় মেয়েদের শাড়ি টেনে খুলে নিয়েছে। ব্লাউজে বুকে হাত দিয়েছে। সারারাত এই অবস্থায় কেউ নর্দমায় কেউ

পুকুরের জলে ডুবে লুকিয়ে থেকে শেষরাত্রে ঘরে ফিরেছে দলে দলে।

আমাদের ওষুধের বাক্স দেখে বিদ্রুপের হাসি ফুটল ঠোঁটে — ''বুদ্ধবাবু পাঠিয়েছে নাকি? শুনেছি নাকি বলেছে — পুলিশ পাঠানো ঠিক হয়নি?''

— ''আচ্ছা দিদি র‍্যাফ কোনদিন বাংলায় গালি দেয়? বেছে বেছে লোকদের পেটায়? ওরা তো ওদেরই ক্যাডার, ইউনিফর্ম পরে এসেছিল।''

সারা গায়ে আঘাতের আঁচড় নিয়ে এসেছেন অন্নপূর্ণা দাস, কমল খাঁড়া। ১০ কাঠা জমির মালিক ছিলেন কমলবাবু। তখন ছিল তিন জনের সংসার। চাষ করে সংসার চালিয়ে টাকা জমিয়ে আজ ২৭ কাঠা জমি করেছেন। আজ সংসার বড় হয়েছে। পুষ্যি ছ'জন । বেশ ভালই চলে যায়।

কিংবা বাজেমেলিয়ার ৩৮ বৎসর বয়সী হিমাদ্রী পাত্র। বলিষ্ঠ চেহারাটার যতটুকু দেখানো সম্ভব, কোথাও বাকি নেই। সারা শরীর জুড়ে কালশিটে। হাত ভেঙেছে। মাথায় গভীর (ত। মাটিতে ফেলে রড দিয়ে পিটিয়েছে র‍্যাফ। বুঝতে পারছেন না আর কোনদিন মাথায় মোট তুলতে পারবেন কিনা।

জমির জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, ভাঙা হাত ও সারা গায়ে আঁচড়ের দাগ নিয়ে বেঁচে থাকা আভা পাত্র, লতিকা কোলে, অলকা কোলেরা। মঞ্জু দের চোখটা তো নষ্টই হয়ে যেত একটু হলে। এর পরেও কোথাও দ্বিমত নেই, সারা সিঙ্গুর সংঘবদ্ধ — শুধু একটি স্লোগানে — ''জান দেব, তবু জমি দেব না। এবার দখল নিতে এলে লাঠিতে হবে না, গুলি চালাতে হবে।''

বেলা গড়িয়ে দুপুর। আমরা এসেছি বেড়াবেড়ি শীতলা মাতা শক্তি(সংঘে। হাতে ওষুধের ব্যাগ, রিপোর্টারের প্যাড। আমরা ডাক্ত(াররা রোগী দেখছি, ওষুধ দিচ্ছি, প্রয়োজনীয় কথাটি টুকে নিচ্ছি নোটবুকে। এবারে দেখা হল উজ্জ্বল মালিকের সঙ্গে। বছর ২৪-এর যুবক। জামা খুলে দেখালেন। সমস্ত শরীর জুড়ে প্রহারের চিহ্(। বিডিও অফিস থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পুলিস চন্দননগর থানায় পিটিয়েছে। সঙ্গে ছিলেন একজন ডাক্ত(ার। সিঙ্গুরেই বাড়ি তাঁর। জমি র(ার লড়াইয়ে তিনিও ছিলেন। তাঁকে এত মারা হয়েছে যে অক্সিজেন দিয়ে রাখতে হয়েছিল হাসপাতালে। এদেরই সঙ্গে এসেছে চার বছরের সুমন দাস। এখনও স্লোগান দিচ্ছে, 'টাটা হঠাও, জমি বাঁচাও।'

বাবার কোলে চড়ে এসেছে আড়াই বছরের পায়েল বাগ। বাবা অ(ণ বাগ জানালেন, তিনদিন ওকে ওর মা কৃষ(া বাগের সঙ্গে আটকে রেখেছিল চন্দননগর জেলে, বাচ্চাটাকে

খেতেও দেয়নি। বাবা বাইরে থেকে খাবার কিনে কোনওরকমে তাকে বাঁচিয়েছেন। ... কী দোষ করেছিল এই আরতি, অন্নপূর্ণা, কমল, হিমাদ্রী, আভা, লতিকা, সরস্বতীরা? তাঁরা তাঁদের মাটি মা'কে ছাড়তে চাননি, এটাই অপরাধ?

সিঙ্গুরে এবার পুজো হয়নি

সিঙ্গুর এবার দুর্গাপুজো করেনি। দীপ জ্বালেনি কালী পুজোতেও। আলোকমালায় সাজেনি সিঙ্গুরের পাঁচটি মৌজা। কোনো বাচ্চা নতুন জামা পরেনি, আতসবাজির ঝলকানিতে সেজে ওঠে নি কোনো অঞ্চল। গোপালনগর পশ্চিমপাড়ায় বারোহাত কালিতলায় কালী মায়ের খড়ের কাঠামোতে মাটি চড়েনি। চোদ্দ প্রদীপ জ্বলেনি অসুর তাড়াতে। আজ রাজ্য সরকার ও তার পুলিশ বাহিনীই এদের কাছে অসুর। এদের পর্যুদস্ত না করে সিঙ্গুর কোনো আনন্দেই অংশগ্রহণ করবে না।

তবে একেবারেই কি পুজো হয়নি? হয়েছে তিনটে। একটা বামুনপাড়া, একটা কায়েতপাড়া, আর একটা পশ্চিমপাড়া। তবে খাঁ খাঁ করেছে গোপালনগরের ঘোষবাড়ির পুজোর পাকা দালান। বাজেমেলিয়ার উত্তরপাড়ায় দৈবক খালের দাসপাড়া বারোয়ারির ১০০

বামুনপাড়ার পরেই মাঝেরপাড়া। সে রাতের বীভৎস লাঠিচার্জ কেড়ে নিয়েছে এক তরতাজা যুবকের প্রাণ। রাজকুমার ডুল। সিঙ্গুরের প্রথম শহীদ। বুদ্ধ-বিমান-নি(পমের উন্নয়নের বলি।

বছরের প্রাচীন পুজো এবার হয়নি। চারিদিকে শুনশান স্তব্ধতাকে খান খান করেছে বামুনপাড়ার বেমানান একলা মাইকের আওয়াজ। মা দুর্গা ছেলেপুলে নিয়ে একা তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে আছেন। কেউ নেই। একটা শিশুও ছিল না যে নতুন জামা পরে ঠাকুর দেখতে এসেছে। ২৫ সেপ্টেম্বর তৃতীয়ার মধ্যরাতে পুলিস ও র‍্যাফের পিটুনি যেখানে গোটা সিঙ্গুরবাসীর হাত পা ভেঙে দিয়েছে, সেখানে সপ্তমীতে আসেনি কোনো আনন্দের হিল্লোল।

বামুনপাড়ার পরেই মাঝেরপাড়া। সে রাতের বীভৎস লাঠিচার্জ কেড়ে নিয়েছে এক তরতাজা যুবকের প্রাণ। রাজকুমার ডুল। সিঙ্গুরের প্রথম শহীদ। বুদ্ধ-বিমান-নি(পমের উন্নয়নের বলি। বছর চব্বিশের যুবক। কাজ করত কোন্নগরে। সোনারূপার। সংসারে তার আয়ই ছিল ভরসা। বাবা দ্বারিক ডুলের জমি বেশি নেই। মাত্র ১৫ কাঠা। ওই জমির ফসলে সম্বৎসরের খরচ চলে না। ছেলের রোজগারই ছিল জীবনধারণের উপায়। পুলিস-র‍্যাফের লাঠির আঘাতে গু(তর আহত রাজকুমার বিডিও অফিসের কাছে জঙ্গলের মধ্যেই পড়ে ছিল। উঠে বাড়ি যাবার (মতা ছিল না। সকালে অর্ধমৃত ছেলেকে খুঁজে পান আহত মা। বাড়ি নিয়ে আসেন কোনওত্র(মে। সিঙ্গুর তখন পু(যশূন্য। পুলিস সবাইকে তুলে নিয়ে গেছে চন্দননগরে।

রাজকুমার বাড়ি এসে বিছানায় কিছু(ণ শুয়ে ছিল। তারপর স্নান করতে গিয়ে হার্টফেল করে। তরতাজা একটি ছেলে।

রাজকুমারের মৃত্যু মাঝেরপাড়াকে পরিচিত করে দিয়েছে সহজেই। বামুনপাড়ার পথ দিয়ে আসতে সকলেই ওর বাড়ি চিনিয়ে দিচ্ছেন এক কথায়। তবু বামুনপাড়ায় পুজো হচ্ছে।

সি. পি. এম.-এর মুখপত্রে ঘোষণা করা হয়েছে, এই ভদ্রলোক তাঁর ষাট বিঘে জমি টাটাদের দিয়ে দিচ্ছেন। অথচ ভদ্রলোক নিজে জানিয়েছেন, তিনি তো ননই, ঘোষপাড়ার একশ ঘরের মধ্যে মাত্র দু'জন চাষী জমি বেচেছেন। এবং তাঁরা এখন একঘরে।

তারস্বরে বাজছে বক্স। কেন? আসলে গোয়ালাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ বামুন-কায়েতদের হয়নি। এঁদের অধিকাংশই চাকরীজীবী। এঁরাই সেই ২৭ শতাংশ মানুষ যাঁরা জমি অধিগ্রহণের জন্য সম্মতি জানিয়েছেন। ভূমিসচিব সুকুমার দাস জানিয়েছিলেন সিঙ্গুরে মোট ৫টি গ্রামের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষক আছেন ৪ হাজার আর বর্গাদারের সংখ্যা ৫০০। কিন্তু ১৯ সেপ্টেম্বর জমি অধিগ্রহণের শেষ দিন পর্যন্ত অধিগ্রহণের সম্মতি জানিয়েছেন মাত্র ১৬০০ জন।

দৈনিক স্টেটসম্যানের সাংবাদিক আশিস ঘোষ দেখা করেছেন গোপালনগর ঘোষপাড়ার কৃষ(কিশোর ঘোষের সঙ্গে। সি. পি. এম.-এর মুখপত্রে ঘোষণা করা হয়েছে, এই ভদ্রলোক তাঁর ষাট বিঘে জমি টাটাদের দিয়ে দিচ্ছেন। অথচ ভদ্রলোক নিজে জানিয়েছেন, তিনি তো ননই, ঘোষপাড়ার একশ ঘরের মধ্যে মাত্র দু'জন চাষী জমি বেচেছেন। এবং তাঁরা এখন একঘরে। গোটা সিঙ্গুর যেন একই সুরের প্রতিধ্বনি করে চলেছে — জান দেব, তবু জমি দেব না। পুলিসের মার খাওয়া মুখগুলো উত্তেজনায় চকচক করছে। 'ওরা আমাদের ভয় ভেঙে দিয়েছে। দেখব আর কত মারতে পারে ওরা। জমি নিতে এলে এবার রক্ত(গঙ্গা বইবে। বুক দিয়ে জমি আগলাবে সিঙ্গুর।'

বাজেমেলিয়া, গোপালনগর, খাসের ভেড়ি, বেড়াবেড়ি — এই সব কটি মৌজার ক্লাবগুলি সংগঠিত করেছে এই নিরস্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে।

একফসলী জমি কাকে বলে?

সরকারপ(ীয়রা সমবেত রবে শোনাচ্ছেন সিঙ্গুরে নাকি সব অনুন্নত ও একফসলী জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। এদের মধ্যে বাস্তুজমি বা বহুফসলী জমি নেই। প্র(ে হল একফসলী

জমি কাকে বলে? যে জমিতে একের পর এক ধান, সরষে, আলু পুঁই ধনে—এত সব ফসল হয়, তারা একফসলী জমি? হ্যাঁ, ১৯৬০-এর দশকের ভূমি-রাজস্ব রেকর্ডে তাই আছে বটে। কিন্তু তার পরে এসব চাষজমির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। একফসলী জমিগুলির উত্তরণ ঘটেছে বহুফসলী জমিতে। কিন্তু সেগুলি রেকর্ড করানো হয়নি। এখানে জমিগুলির বর্গাদারেরাও সব 'নন রেকর্ডেড', নথিভুক্তি(হীন। জমির মালিকরা জমির ফসলে কর্তৃত্ব দেখাতে পারেন না, বর্গাদারেরা যা দেন, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। জমির ওপর তাঁরা প্রত্য(ভাবে নির্ভরশীলও নন। তাঁদের অধিকাংশই কলকাতায় চাকরি করেন, পড়াশোনা করেন, গ্রামে বড় বাড়িঘর আছে(ফলে এই সব মালিকেরা জমি বেচে দিতে আপত্তি করবেন না। এ জমি তাঁদের গেলেই ভালো। আর আছেন তাঁরা, যাঁরা জমি আগেই বেচে দিয়েছেন, কিন্তু মিউটেশন করানো হয়নি। ফলে জমির আসল চাষী মালিককে ফাঁকি দিয়ে এরা সরকারকে জমি দিয়ে দেবে। এই সুযোগটাই সরকার নিয়েছিল। তারা প্রচার করতে শু(করেছে, সিঙ্গুরে জমির আন্দোলন আসলে নন-রেকর্ডেড বর্গাদারদের সুবিধাবাদী আন্দোলন। আসল মালিকরা এদের সঙ্গে নেই। আর ভূমি দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী যাঁরা চেক নিয়েছেন, তাঁরা এঁরাই। বাকি ৭৩% মানুষ চেক নেয়নি। সিঙ্গুরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে আন্দোলনের বাঁধভাঙা স্রোত কাকে বলে। প্রকৃত কৃষক আন্দোলন এদের দেখেই বোঝা যায়। পাঁচ-ছয় মাস ধরে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি দেখলে অবাক হতে হয়। অথচ রাজ্যের এই শাসকদলই সিঙ্গুরে লাঠিচার্জ করে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিপ(সওয়াল করছে।

'টাটাকে দেবার জন্য প্রস্তাবিত জমির যে ম্যাপ করা হয়েছে, তাতে রয়েছে সাঁইত্রিশটা মিনি ডিপ টিউবওয়েল যার এক-একটা পনের একর জমিতে সেচের কাজ করে। আছে তিনটে হেভি ডিপ টিউবওয়েল। তাছাড়া প্রাকৃতিক সেচ-ব্যবস্থা, নদী-নালার অভাব নেই এখানে। ডিভিসি ক্যানেলের জল প-াবিত হয় এখানে। এখানকার জমি একফসলী হওয়া সম্ভব?' বললেন উজ্জ্বল মালিক। সিঙ্গুরের পাঁচটা কোল্ড স্টোরেজের সমস্ত আলুর সরবরাহ আসে সিঙ্গুর থেকেই। মন্ত্রী নি(পম সেনের জেলা বর্ধমান থেকে প্রচুর ে(তমজুর আসেন সিঙ্গুরের জমিতে কাজ করতে। তাঁরাও আন্দোলনে সামিল হতে চাইছেন।

২৬/০৯/০৬-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ''(তিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের একজনকে চাকরি দেবেন রতন টাটা। পাশাপাশি, জমির জন্য বাজারদরের ৫২ শতাংশ বেশি দাম দেবে রাজ্য সরকার।'' অতীতে যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু এ প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মেলে না। তাঁরা হাসবেন একথা শুনলে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিমত রতন টাটা যদি চাকরি দেনও, কি চাকরি দেবেন? টাটারা জামসেদপুর থেকে যন্ত্রাংশ তৈরি করে এনে এখানে 'অ্যাসেম্বলিং' করবেন। তার জন্য দ(শ্রমিক দরকার। সে দ(তা সিঙ্গুরে কৃষকদের কতজনের আছে? যে শরীরটা কোমর বেঁকিয়ে নীচু হয়ে ধান রোয়, ভেজা মাটির গন্ধ যাদের শরীরের পরতে পরতে, তারা কিভাবে সস্তায় মোটরগাড়ি কারখানায় যন্ত্রাংশ জুড়বেন? এতে টাটাদের উৎপাদনশীলতা কি বাড়বে? নাকি ভিন রাজ্য থেকে দ(শ্রমিকবাহিনী এনে কাজ করানোয় তাদের লাভ বেশি!

চাকরির মেয়াদ এক প্রজন্মেই শেষ হয়। জমি বংশানুত্র(মিক আয়ের উৎস। নেতারা যতই গলা ফাটান কৃষিতে আয়ের পরিমাণ কমেছে বলে — বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু একেবারেই তার উল্টো। '৬০-এর দশকের একফসলী জমি আজ আ(রিক অর্থেই বহুফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে। সিঙ্গুরের অধিবাসীরা বলেন, এ মাটির আলুর স্বাদই আলাদা। সার না দেওয়া স্বর্ণমাসুরী, আমন ধানের পাতার রংই আলাদা। এভাবে দেশের উর্বরতম কৃষিজমিকে ধ্বংস করলে ভবিষ্যতে খাদ্য সঙ্কটের আশঙ্কা করছেন কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা। ৮/৭/০৬ তারিখে টাইম্স অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত তাঁর বিধানসভা-বক্ত(ব্য থেকেই এটা পরিষ্কার। সেখানে স্পষ্টই তিনি বলেছেন, ''রাজ্যে বর্তমানে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়, কিন্তু ভবিষ্যতে খাদ্য

কৃষিনির্ভর একটি জাতির জীবন ও সংস্কৃতির পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে কৃষি। জমি তার মা, সে মায়ের উপস্থিতি তার গানে, কবিতায়, উৎসবে-পার্বনে, জীবনের প্রতিটি (ে ত্রে।

নিরাপত্তা হীনতার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিজমিকে অকৃষি কাজে ব্যবহারই দায়ী।''

তাছাড়া কৃষিনির্ভর একটি জাতির জীবন ও সংস্কৃতির পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে কৃষি। জমি তার মা, সে মায়ের উপস্থিতি তার গানে, কবিতায়, উৎসবে-পার্বনে, জীবনের প্রতিটি (ে ত্রে। বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে যে-সংস্কৃতি সে লালন করেছে, তাকে রাতারাতি কলের মজুর বানিয়ে দিলে, সে-সংস্কৃতি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তার আত্মপরিচয়ের শিকড়ে টান পড়ে, সভ্যতার ধারাবাহিকতার মূলোৎপাটন হয়।

যে খাদ্যশস্য সে চাষ করে তা কেবল তারই খিদে মেটায় না, যারা চাষ করে না তাদেরও খাদ্য জোগায়। সরাসরিভাবে ভাগচাষী, খেতমজুর পরিবার কেবল খাদ্যের জন্য জমির ওপর নির্ভর করে তাই নয়, তাদের সঞ্চয়ও হয় এই জমি থেকে। পশুপাখির খাবার তৈরি হয়। বজায় থাকে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য। সেই জমি যখন কোনো কারখানাকে দিয়ে দেওয়া হয়, সমস্ত ভারসাম্যটাই নষ্ট হয়ে যায়। সরকারের প্রস্তাবিত মানচিত্রে টাটাদের জন্য ৩০৩৯ বিঘা বা ৯৯ একর জমিই কেবল চিহ্নি(ত করা হয়েছে। যেটা চিহ্নি(ত নেই তা হল — যে জমি শিল্পের বর্জ্যের ফলে দূষিত হবে, নষ্ট হবে যে জনপদ, শিল্পতালুকের আশেপাশে আর যত জমিতে কোনদিনও ফসল ফলবে না।

আর চিহ্নি(ত নেই সেই সংস্কৃতি-নিধনের কথা, যে গানে জড়িয়ে আছে সুজলা সুফলা বাংলা, যার ভিত গড়ে উঠেছে এই বাংলার কৃষিকে কেন্দ্র করেই।

রাজ্যে আর জমি ছিল না?

২৮/৯/০৬-এর টাইম্স অব ইন্ডিয়ায় প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি বলেছেন, ''সি. পি. এম. আমাদের শিল্পায়ন বিরোধী হিসেবে চিহ্নি(ত করতে চাইছে। এটা একটা ভুল ধারণা। আমরা শিল্প চাই, কিন্তু তা বহুফসলী জমির বিনিময়ে নয়। রতন টাটা কি সিঙ্গুরের উর্বর জমির ফালিটুকুই চেয়েছিলেন? বীরভূম, বাঁকুড়া বা পু(লিয়ায় কি কোনো পতিত জমি নেই?''

হাওয়ায় ভাসছে স্লোগান — কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। গ্রাম শহরময় সরকারি হোর্ডিংয়ে ছেয়ে গেছে। আর পাঁচটা ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ভিনাইল-ফ্লেক্স হোর্ডিংয়ে পাল্লা দেওয়া। শিল্পটা যে কী বস্তু, খায় না মাথায় দেয়, বোঝে না বন্ধ কারখানায় শ্রমিকের স্ত্রী। অভাবের জ্বালায় স্বামী আত্মহত্যা করেছে। ছেলেটা আজ অন্ধ কানাগলিতে মাস্লম্যানের সহচর। মেয়েটা মুখে রং লাগিয়ে বরাহনগরের রাস্তায় দাঁড়ায়। চোখে আর জলও আসে না। এই তো সেদিনও বি. টি. রোডের দু'পাশে সারি সারি কারখানাগুলো আকাশে ধোঁয়া ওড়াতো। শোনা যেত শিফ্ট বদলের ভোঁ। আর আজ! বিদেশি শিল্পপতি ধরার জন্য নেতারা এবেলা ওবেলা বিদেশ দৌড়োচ্ছেন। আজ যাদের প্রশস্তি করছেন, আড়াই দশক আগে তাদের 'কালো হাত' রোজ দুবেলা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতেন। বি. টি রোডের দুপাশে কারখানাগুলো আজ বন্ধ। হয় না বি(কর্মা পুজো। সেখানে একে একে গড়ে উঠছে বহুতল আবাসন, পার্কিং স্পেস। এক উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতেই বন্ধ কারখানার জমির পরিমাণ ৫৪৩৫ বিঘা।

শুধু ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কারখানায় **অব্যবহৃত** জমির পরিমাণ

পলতা আনমোল	—	১০০	বিঘা
টিটাগড় জুটমিল	—	১০০	,,
হিন্দওয়ার লিমিটেড, খড়দা	—	২৫	,,
ক্যালকাটা সিল্ক মিল, খড়দা	—	৫০	,,
হিন্দুস্থান ওয়ার লিমিটেড, পানিহাটি	—	৪০	,,
কমো পোলাইট, পানিহাটি	—	১০	,,
ইনবেরি মেশিনারিস	—	১০	,,
এ পি এল রঙকল	—	২৫	,,
টেক্সম্যাকো পানিহাটি ওয়ার্কস	—	৩০	,,
কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং, পানিহাটি	—	২০	,,
সোদপুর পটারিজ	—	২৫	,,
বাসন্তী কটন মিল, সোদপুর	—	৪০	,,
বেণী ইঞ্জিনিয়ারিং, কামারহাটি	—	৫০	,,
রমনলাল ইন্ডাস্ট্রিজ, কামারহাটি	—	৩০	,,
শেখর আয়রন অ্যান্ড স্টিল, কামারহাটি	—	২০	,,
মোহিনী কটন মিল, কামারহাটি	—	১০০	,,
ওরিয়েন্টাল কটন মিল, কামারহাটি	—	১৫	,,

হিন্দুস্তান সেফটি গ্লাস, বেলঘরিয়া	—	৫০	বিঘা
আই. আই. সি. বনহুগলি	—	১৫০	,,
কমলা ইঞ্জিনিয়ারিং, বরানগর	—	৩০	,,
বিরাটি টেক্সটাইল মিল, দমদম	—	১০০	,,
এইচ. এম. ভি. দমদম (অব্যবহৃত)	—	২৫	,,
জেসপ, দমদম (অব্যবহৃত)	—	১০০	,,
বেঙ্গল আনমোল, নোয়াপাড়া	—	৩০০	,,
মহালক্ষ্মী কটন মিল, নোয়াপাড়া	—	৪০০	,,
ডানবার কটন মিল, জগদ্দল	—	১৫০	,,
অন্নপূর্ণা মিল, জগদ্দল	—	৬১০	,,
টিটাগড় কপার মিল (২) ভাটপাড়া	—	৫৫০	,,
উল্কা মম, ভাটপাড়া	—	৩৫০	,,
হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড	—	১৩২	,,
ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প, বীজপুর	—	৩৫০	,,
ক্যান্টনমেন্ট অ্যান্ড ক্লেসার	—	৪৩৫	,,
গৌরীপুর জুটমিল	—	৭৫০	,,
জনসন অ্যান্ড নিকলসন	—	২৬০	,,

[সূত্র দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৬]

একই দিনে এই পত্রিকাই জানাচ্ছে, কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'নব সাম্রাজ্যবাদ কৃষি শিল্প বিতর্ক' নামে বই প্রকাশ করতে গিয়ে আর এস. পি.র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ''সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করছে বামফ্রন্ট সরকার। এখন বিতর্ক চলছে ফ্রন্টের মধ্যেই, বামফ্রন্ট সরকার আর সংগ্রামের হাতিয়ার নয়।'' শুধু আর এস. পি.র রাজ্য সম্পাদকই নন, সিঙ্গুরে উর্বর জমি টাটাদের কেন দেওয়া হচ্ছে সে নিয়ে প্র্ন তুললেন, সি. পি. আই-এর রাজ্য সম্পাদক মঞ্জুকুমার মজুমদারও। সি পি আই চায় টাটাদের কারখানা হোক অনুর্বর পু(লিয়াতে। অনেকদিন চুপ করে থেকে বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল সি পি আই এবার মুখ খুলেছে। সারা দেশে কৃষিজমি নিয়ে এক নীতি, আর বাংলায় এসে সে নীতি কেন বদলে যাবে — প্র্ন তুলেছে দলের কৃষক সংগঠন 'সারা ভারত কৃষক সভা'। রাজ্যের মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য বলেছেন, ''দ্বিচারিতা নিয়ে আমরা এগোতে পারবো না''। তিনি আরও বলেন, ''কোথায় কোন শিল্প হচ্ছে, কী শর্তে হচ্ছে, তা জানার অধিকার রাজ্যের জনগণেরও আছে। তথ্য জানার অধিকার আইন পাশ হয়ে গেছে। তাই সমস্ত মানুষেরই শিল্পের বিষয়ে জানার অধিকার আছে।''

সি পি আই কৃষক সভার জাতীয় নেতা অতুলকুমার অনজান বলেছেন, ''আমরা মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িষ্যাসহ সারা দেশেই লড়ছি এই জমি অধিগ্রহণের বি(দ্ধে। ... এই ব্যাপার এই রাজ্যে কীভাবে চলবে? ওখানে আমরা আন্দোলন করতে পারি, এখানে নয় কেন?'' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে অনজান পরামর্শ দিয়েছেন — গ্রামের পতিত

জমিতে নিয়ে যান টাটা, সালিম, আম্বানিদের। রাস্তা, রাজ্য সরকার বানিয়ে দিন, পরিকাঠামো তৈরি করে দিন। ... এই রাজ্যের কৃষকদের জমি চলে গেলে তাঁদের কলকাতার রাস্তায় ভি(া করা ছাড়া আর গতি থাকবে না। (দৈনিক স্টেট্‌সম্যান, ৩০ অক্টোবর, '০৬)

বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রি(য়া

২৩৫টি আসনে জেতা দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করা একটা সরকারের প্রধান দাবি করেছেন যে তাঁরা সমাজতন্ত্র নয় পুঁজিবাদেরই 'প্র্যাকটিস' করছেন। সে প্রসঙ্গে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র ১৭ আগস্ট '০৬ দেশ পত্রিকার প্রবন্ধে বলেছেন, ''মার্কসবাদী বলে নিজেদের দাবি করেন এমন কেউ কেউ এ ধরনের যুক্তি(পেশ করছেন, তা ভেবেও লজ্জাবোধ হয়। মার্কস যে প্রসঙ্গে পুঁজির প্রসার চেয়েছিলেন, তা উপে(া করা হয় বাতুলতা, নয় দুরভিসন্ধিমূলক। ভূমিহীন কৃষক কিংবা ছোট চাষি অথবা বিবিধ কুটির শিল্পে নিযুক্ত(গরিব কারিগর, যাঁরা সারা দেশে হাজার-ল(খেতে-খামারে-তাঁতখানায়-কামারশালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তাঁরা শোষিত, তাঁরা অত্যাচারিত, অথচ তাঁদের প্রতিবাদ জানাবার শক্তি(নেই(তাঁরা যেহেতু এত বি(প্তভাবে অবস্থান করছেন, তাঁদের সংগঠিত করা দুঃসাধ্য, অত্যাচারের বি(দ্ধে (খে দাঁড়ানোও তাই তাঁদের প(এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। এখানেই পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। পুঁজির সাহায্যে কারখানার মালিক শিল্পের বিস্তার ঘটান। হাজার হাজার শ্রমিক দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসে মস্ত বড় কারখানার বিরাট চৌহদ্দির মধ্যে কর্মরত হন। কারখানার সংলগ্ন ব্যারাকে তাঁরা বসবাস শু(করেন। পুঁজির আশ্চর্য কসরতে শ্রমজীবী সম্প্রদায় কাছাকাছি আসেন, পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে ক্র(মশ অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়ে তাঁরা মালিক প(র বি(দ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁরা যেহেতু অবস্থানের বিচারে আর বিচ্ছিন্ন নন, সুবিশাল কারখানা ও তার সন্নিহিত ভূমিতে সুশৃঙ্খলায় সংস্থিত, অত্যাচারী পরাক্র(ান্ত পুঁজিবাদীদের বি(দ্ধে আন্দোলনে রত হওয়া তাঁদের প(এখন অনেক সহজ। পুঁজিকে সংহার করার জন্যই পুঁজির সংহতি প্রয়োজন। কিন্তু পুঁজির সেই অগ্রগতি ঘটানোয় শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের কোনও ভূমিকা নেই, থাকতে পারে না। যাঁরা শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন, তাঁদের কর্তব্য প্রতি মুহূর্তে শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থ সম্প্রসারণ। তা না করে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর অনিষ্ট সাধন করে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটাবেন, এই বাতুল তত্ত্ব কোনও ব্যাকরণ বইতে লেখা নেই। কৌশলগত কারণে পুঁজিপতিদের সঙ্গে ইতস্তত সাময়িক বোঝাপড়া হতে পারে, কিন্তু সেই বোঝাপড়া শ্রমিকদের স্বার্থে, মালিকদের স্বার্থে নয়, সংগঠন ও ধর্মঘটের অধিকার কিছুতেই বিলুপ্ত করে নয়। যাঁরা অন্য রকম বলবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা সবিনয়ে বলব, আর যাই হোন, মার্কসবাদী নন, কোন কুলেরই বামপন্থী নন পর্যন্ত।''

টাটার শর্ত ও স্বামীনাথন কমিটির রিপোর্ট

১০ অক্টোবর ২০০৬-এর দৈনিক স্টেটস্‌ম্যানের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে টাটার চিঠি। তার থেকে জানা যাচ্ছে, এক হাজার একর জমি টাটাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের রাজস্ব ঘাটতি হবে ১২০ কোটি টাকা। আর টাটারা রাজ্য সরকারকে জমি বাবদ দেবে মাত্র ২০ কোটি টাকা। তাও পাঁচ বছর বাদে ০.০১ বার্ষিক শতাংশ হারে সুদ

সমেত। রাজ্য সরকার কোন সুবিধাই পাচ্ছে না। বরং নিয়মবহির্ভূত ভাবে নামমাত্র মাশুলে বিদ্যুৎ, জলকরে ছাড়, স্ট্যাম্প ডিউটি মজুত ইত্যাদি। শিল্পমন্ত্রী নি(পম সেন অবশ্য বলেছেন, এ শর্ত নাকি খড়গপুরে মোটর গাড়ি কারখানার জন্য দেওয়া হয়েছিল। সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা নিয়ে চূড়ান্ত কোনও চুক্তি(হয়নি। অথচ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের কাছে কি মুখ্যমন্ত্রী, কি শিল্পমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে টাটার শর্ত বললেন না। রাজ্য সরকার নিজে সিঙ্গুরের চাষের জমি টাটাদের দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেও রাজ্যের প্রান্ত(ন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পরিষ্কারভাবে দলীয় নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছেন, বিনা পয়সায় কোনও শিল্পপতিকে জমি দেওয়া যাবে না। [সূত্র ১৪ অক্টোবর ২০০৬, দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান]

এদিকে ১৪ অক্টোবর ২০০৬, দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান জানাচ্ছে, টাটাদের প্রস্তাবিত মোটর কারখানার জমি অধিগ্রহণের প্র্ে সম্মতি দিলেও শর্ত নিয়ে জনমত যাচাই করতে এককাট্টা হচ্ছে বামশরিক দলগুলি। প্রস্তাবিত প্রকল্পের শর্তাবলী কতটা (তিকারক তা নিয়ে মত-বিনিময় যাচাই করতে নিজেরাই অন্য শরিক দলগুলির সঙ্গে দ্বিপা(ক বৈঠক করবে বলে আর. এস. পি জানিয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, টাটাদের কী শর্তে জমি দেওয়া হচ্ছে, তা জানাতে বাধ্য রাজ্য সরকার। এ রাজ্যের জমি নি(পমবাবুর পৈতৃক সম্পত্তি নয়।

''সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা হবেই। কে (খবে। আপনারা বেশি বেশি করে লিখছেন বলে ওরা তাই বলছে। ওরা ভেবেছে, আপনারা ওদের ছবি ছাপাবেন, এসব কথার কোনও গু(ত্ব নেই।'' — ১৮ অক্টোবর মহাকরণে সাংবাদিকদের প্র্ের জবাবে সিঙ্গুর ইস্যুতে সি. পি. আই.-এর প্রতি এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সি. পি. এম.-এর রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু একই কায়দায় নদিয়াতে শরিক দলগুলিকে, বিশেষত সি পি আইকে তুলোধোনা করেছেন। অবস্থা সামাল দিতে জ(রি বৈঠক ডাকছে সি পি এম। সি. পি. আই.-এর দাবি, অর্থাৎ সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা নির্মাণের জন্য এবং আম্বানি ও সালিমদের কী শর্তে হাজার হাজার একর কৃষিজমি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে প্রকাশ্যে, তা জানানোর ব্যাপারে অন্য শরিক দলগুলি তাদের সমর্থন জানিয়েছে। আর. এস. পি.-র কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা মনোজ ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীর কটা(কে দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন। শরিক দলগুলির উদ্দেশে তিনি কটা(করার কে? দলের অন্য সদস্য গীতা সেনগুপ্ত বলেছেন, ''ফ্রন্টের মধ্যে থেকে কোনও প্র্ে তুললে আমরা খারাপ হয়ে যাচ্ছি। ফ্রন্ট রেখে লাভ কি? বামফ্রন্ট ভেঙে দিন।'' এস. ইউ. সি. আই.-এর রাজ্য সম্পাদক প্রভাস ঘোষও টাটাসহ বিভিন্ন শিল্পপতিদের কী শর্তে হাজার হাজার একর জমি দেওয়া হচ্ছে, প্রকাশ্যে জানানোর দাবি করেছেন।

শুধু শরিকদেরই নয়, নিজের মন্ত্রীসভাকেও তথ্য দিলেন না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্প স্থাপনের জন্য হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় তিন বাজার একর জমি অধিগ্রহণ সংক্র(ান্ত বিষয় নিয়ে ১৯ অক্টোবর রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও জলসম্পদ মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের মধ্যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ হয়। মন্ত্রীসভায় সদস্যদের যখন জানানো হয় আরও এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণের কথা, তখন নন্দবাবু এই জমির চরিত্র, অর্থাৎ কত-ফসলি জমি তা জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধদেববাবু এর উত্তর দেননি। ভূমিসংস্কার মন্ত্রীও এ ব্যাপারে বলেন, ''আমাকে লিখিতভাবে চিঠি দিন, সব জানিয়ে দেব।''

বিষয়টি নিয়ে ে োভে ফেটে পড়েন শরিক দলের মন্ত্রীরা। ভূমিসংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লাকে নিয়েও সি পি এম যথেষ্ট অস্বস্তিতে।

স্বামীনাথন কমিটির রিপোর্ট

গত ৬ অক্টোবর, ২০০৬ ডঃ এম. এস. স্বামীনাথনের নেতৃত্বে দিল্লীতে কৃষকদের জাতীয় কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছে, তা বামফ্রন্ট সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলার প(যথেষ্ট। এই রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে যে উর্বর জমিকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও অন্যান্য অকৃষিকাজে ব্যবহার করা যাবে না। সেইসঙ্গে কৃষকদের স্বার্থে বর্তমান জমি অধিকার আইনকে সংশোধন করে ভূমিহীনদের বণ্টন করারও সুপারিশ আছে। এদিন কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে ডঃ স্বামীনাথন জানিয়েছেন, কৃষকদের মোট আর্থিক উপার্জনের সম্ভাবনা বাড়াতে, কৃষিজমির অর্থনৈতিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে, যে নীতি রয়েছে তার পরিবর্তে সরকারের প্রথমেই উচিত কৃষকদের জন্য একটি নীতি গঠন করা।

রাজারহাটের জমিহারা কৃষকরা কেমন আছেন?

মাসখানেক আগে ভূমি অধিগ্রহণ আইনকে প্রয়োগ করে সরকার সিঙ্গুরে প্রায় হাজার একর (৯৪১.২৬) জমি অধিগ্রহণ করে খাস ঘোষণা করে দিলেও জেলা প্রশাসন এখনও স্বেচ্ছা-জমিদাতার সংখ্যা বাড়াতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। জমি দিতে নারাজ মালিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে দেখা করছেন, বোঝানোর পাশাপাশি জমি দিতে চাপও প্রয়োগ করছেন বলে অভিযোগ উঠছে। আসল মালিকদের (তিপূরণ বাবদ চেক দেওয়ার মেয়াদ ৩১ অক্টোবর '০৬ করে দেওয়া হয়েছে। স্বেচ্ছায় যাঁরা জমি দেননি তাঁদের জন্য এখনও জমির সরকারি মূল্যের ওপর সাড়ে সাত শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। যাঁরা মিউটেশন করতে বিডিও অফিসে যাচ্ছেন, তাঁদের জামাই আদর করা হচ্ছে। প্রশাসন বুঝতে পেরেছে, চরম প্রতিরোধের মুখে না পড়তে হলে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যতটুকু করা যায়।

ঠিক এমনিভাবেই ২০০৩ সালে রাজারহাটের কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে হিডকোকে দেওয়া হয়েছিল। যে বালিগড়িতে বিনা রক্তে(হিডকোকে জমি ছেড়ে দেননি কৃষকরা, সেখানে তাঁরা কেমন আছেন? আসুন দেখি দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান-এর সুকুমার মিত্র তাঁদের দেখে এসে কী লিখছেন।

এক কৃষকের কথা লিখেছেন সুকুমারবাবু। তিনি বালিগড়ির ইউনুস। শুধুমাত্র লঙ্কা চাষ করে সব খরচ মিটিয়ে তিন মাসে বিঘা প্রতি লাভ করেছেন ১৫ হাজার টাকা। বছরে চারটি ফসল ফলত তাঁর জমিতে। লঙ্কা, বোরো ধান, আমন ধান ও সরষে চাষ করে এক বিঘা জমিতে লাভের পরিমাণ গড়ে ছিল ২২ হাজার টাকা। তিন বিঘা জমির মালিক রাজারহাটে মাসে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা অনায়াসে আয় করতেন। একজন ভূমিহীন খেতমজুর দৈনিক ৫০ টাকা মজুরিতে মাসে দেড় হাজার টাকা আয় করতেন। এক বিঘা জমির লঙ্কা বেচে আসত ৩০ হাজার টাকা। প্রতি কেজি ৫০ পয়সা দরে লঙ্কা তুলে মেয়েরা দিনে ২৫ টাকা আয় করত। চাষের উৎপাদন থেকে নিজেদের খোরাকি থাকত। আজ শুধু সেই খাবারটুকু জোগাড় করতে কাবুলিওয়ালাদের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে তাদের।

বৃদ্ধ ফকির আলি গাজি। এক আনা থেকে ৬০ টাকা মজুরিতে কাজ করে সংসার চালিয়েছেন। কৃষিজমি চলে যাওয়ার পর কাজ হারিয়ে ফকির জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন ভ্যান চালানোকে। আশি পেরোনো ফকিরের একে একে চার ছেলে অভাবে মারা গেছে। গায়ে শক্তি(নেই ভ্যান টানার। তিনি প্রকৃতই ফকির হয়ে গেছেন নিউ টাউনের ফলে। লোকের হাতে পয়সা নেই, নেই ভ্যানে চাপার যাত্রীও। তাই গ্রাম থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে ভাড়ার আশায় প্রতিদিন কাকভোরে ছুটে যেতে হয় ফকির আলিদের। কোনওদিন ভাড়া জোটে, কোনওদিন বা জোটে না।

টাটার হুমকি জমি না পেলে অন্য রাজ্যে চলে যাবে

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৬। পুনার খবর, টাটা মোটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবিকান্ত আশা করছেন, ২০০৬ শেষ হওয়ার আগেই তাঁরা এক ল(টাকার স্বপ্নের মোটরগাড়ি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি পশ্চিমবঙ্গে পেয়ে যাবেন। না পেলে তাঁরা অন্য রাজ্যে চলে যেতেও পারেন।

এখানে রবিকান্ত উল্লেখ করেছেন তাঁদের উত্তরাঞ্চলের জমির কথা। পশ্চিমবঙ্গে জমি না পেলে সেখানে চলে যেতে পারেন বলে হুমকিও দিয়েছেন। যা শোনার পরে কংগ্রেস তৃণমূলে ত্রাহি ত্রাহি রব, কে কত বড় শিল্পবন্ধু, তা প্রমাণের জন্য এঁরা সবাই উঠেপড়ে লাগলেন। চিঠি পাঠালেন বুদ্ধবাবুকে — টাটাকে থাকার জন্য অনুরোধ করে। তা এই উত্তরাঞ্চলে জমিদখল কার্য কি টাটারা খুব নির্বিঘ্নে করতে পেরেছিল? দেখাই যাক।

উত্তরাঞ্চলে কম দামে টাটাকে জমি দেওয়া নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল শিল্পপতিদের মধ্য থেকেই। উত্তরাঞ্চলের পন্থনগরেই প্রথমে টাটারা ছোটগাড়ি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। পরে রতন টাটার ইচ্ছায় সেটা পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করার কথা ভাবা হয়। এই রাজ্যে শিল্পের জন্য জমি নিতে গেলে সরকারকে দিতে হয় প্রতি বর্গ মিটারে ৭৫০ টাকা। টাটাদের (ে ত্রে উত্তরাঞ্চল সরকার নিয়ম ভেঙে প্রতি বর্গমিটার ১২৫ টাকা করে জমি দিয়েছিল। শিল্পপতিরা অভিযোগ করেছেন, যে-জমি টাটাদের দেওয়া হয়েছে, সেই ৩ হাজার ৩০০ একর জমিতে জি. বি. পন্থ কৃষি বি(বিদ্যালয় ছিল। এই ফাঁকা জমিতে কৃষি গবেষণা হত। পরিকাঠামো তৈরি করতে সরকারের যে টাকা খরচ হয়েছে, তা তোলা হচ্ছে অন্য শিল্পোদ্যোগীদের কাছ থেকে। পশ্চিমবঙ্গে জমি নিয়ে বিতর্ক শু(হবার পর, টাটারা প্রকল্পটি ফের উত্তরাঞ্চলে পন্থনগরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে কথা শু(করে দিয়েছে।

> ... টাটা গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় কীর্তি জামসেদপুরের ইস্পাত কারখানার কথাই ধ(ন না কেন। জামসেদপুরে টাটাদের বিভিন্ন কারখানায় কয়েকশো, বড় জোর কয়েক হাজার, প্রধানত ভিন্ন রাজ্যের মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত চাকুরের সংস্থান হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিহার বা ঝাড়খণ্ডের কথা বিবেচনা ক(ন, বিবেচনা ক(ন গোটা ছোটনাগপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা। টাটাদের কারখানা পত্তনের পর একশো বছর গড়িয়ে গেছে, ঝাড়খণ্ড যে তিমিরে সেই তিমিরেই। আদিবাসী সম্প্রদায় ধুঁকেপুকে কোনও ত্র(মে টিকে আছে কি নেই, ইস্পাত প্রস্তুত ও তজ্জনিত অন্য নানা

> শিল্পাবিন্যাস থেকে এমনকী 'পরো(' শুভফলও আদিবাসী-অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডীদের ওপর ছিটেফোঁটাও বর্ষিত হয়নি। একশো বছরের শবরী-প্রতী(ার পর তাঁদের মধ্যে কারও কারও যদি এখন 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা সংগ্রহের সাধ জাগে, অভিযোগের আঙুল কোন দিকে তুলব আমরা?
>
> ... স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে দীর্ঘতম শ্রমিক ধর্মঘটের তালিকায় একেবারে শীর্ষস্থানে ১৯৫৮ সালে জামসেদপুরে টাটা ইস্পাত কারখানায় তিনমাস ব্যাপী ধর্মঘট। শ্রমিকদের ন্যূনতম সুবিধাদি ও মর্যাদার দাবিতে সংঘটিত সেই ধর্মঘট সফল পরিচালনার কৃতিত্ব পুরোটাই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের।
>
> ইতিহাস ঠিক হারিয়ে যায় না, কখনও-সখনও, সম্ভবত সাময়িকভাবে, চোরাগোপ্তা রাহাজানির শিকার হয়। ব্যক্তি(মানুষের স্মৃতি কিন্তু অহরহ চিরতরে হারিয়ে যায়। সে জন্যই, সানুনয় নিবেদন, গরজ যেহেতু বড় বালাই, কোনও বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীকে বন্দনা ক(ন, তবে দোহাই, একটু রয়ে-সয়ে, মাত্রাজ্ঞান না-হারিয়ে, এবং সাচ্চা থেকে ঝুট-কে ঈষৎ একটু ছেঁকে নিয়ে।
>
> অশোক মিত্র ।। আনন্দবাজার, ১৭ অক্টোবর ২০০৬

একই পার্টি, দুই মুখ

শ্রমিক নেতা শ্যামল চক্র(বর্তীরা যেখানে সিঙ্গুরে জমির বিতর্কে প্রবলভাবে রাজ্য সরকারের পে(যুক্তি(দিচ্ছেন, বিরোধীদের দাবি নস্যাৎ করছেন, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে স্পঞ্জ আয়রন, ফেরো অ্যালয়ের গণ-কনভেনশনে তাঁদের ভূমিকা ছিল ঠিক উল্টো। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে প্রকাশ্য সভায় এতদিন ধরে তোয়াজ করে আনা শিল্পপতিদের মাফিয়া, শোষণকারী, কালোয়ার, অত্যাচারী বলে চিহ্নি(ত করে 'সিটু'। শ্রমমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''কারখানা মালিকরা যেন এমনটা ভাববেন না, যে তাঁরা যেমনটি চাইবেন তেমনটি হবে। এভাবে বন্ডেড লেবারের মত লোক খাটাবেন, আর যা খুশি মজুরি দেবেন, যতখুশি দূষণ ছড়াবেন, ওসব আর চলবে না।''

এবার শুনুন, সি পি এম-এর হিমাচল প্রদেশ রাজ্য কমিটির বিবৃতি

''বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার নামে রাজ্য সরকার উন্নত চাষজমি বড় বড় শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিতে আগ্রহী। এই জমিগুলির মধ্যে আছে উনা, কাংড়ার আশেপাশের উন্নত চাষজমি। মানালিতেও সরকার নামমাত্র দামে জমি বেচে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে সি. পি. এমের গু(তর আপত্তি আছে। রাজ্যে কৃষি(ে ত্রে সঙ্কট রয়েছে। চাষ করাটা অলাভজনক হয়ে পড়ছে, চাষিরা ভূমিহীন হয়ে পড়ছেন। গত কয়েক বছরে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। তার উপর সরকার দু'হাজার একর জমি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে দিতে চায়। এতে প্রচুর কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়বেন। তাঁরা বাস্তুহারা হবেন।''

[সূত্র দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান ২০.৯.০৬]

এবার কর্নাটকে

এখানেও সিঙ্গুর-রাজারহাটেরই পুনরাবৃত্তি। উর্বর কৃষি এলাকা সমৃদ্ধ কোলার জেলায় জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি হয়েছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরির জন্য বাঙ্গালোরের উত্তরে দেবানাহাল্লির জমি নেওয়া হচ্ছে। এখানে (মতায় আছে জনতা দল, সেকুলার আর বিজেপি জোট। আর বিরোধিতায় নেমেছে সংযুক্ত(জনতা দল আর সি.পি.এম।

কর্নাটকে সি. পি. এমের কৃষক সংগঠন পোরটা রায়তু সংঘ বা কৃষক রাজ্য সম্পাদক ডি. সি. বায়নারেড্ডিরা আন্দোলনে নেমেছেন। বলেছেন, ''কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার আমরা (খতে চেষ্টা করেছি।'' কোলার, ম্যাঙ্গালোর, বাঙ্গালোর গুলবর্গা, বিজাপুর এবং দ(িণ কানাড়া জেলায় কৃষকসভা আন্দোলন চালাচ্ছে। বাঙ্গালোর নগর জেলার আনিকেলে এঁরাই আন্দোলন করে আবাসন প্রকল্পের কাজ (খে দিয়েছেন। চারটি গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করে আন্দোলন চলছে।

দেবানাহাল্লিতে সি. পি. এম. জমির ন্যায্য দামের জন্য লড়াই করছে। এখানে জমির দাম একর প্রতি দেড় থেকে দুই কোটি টাকা। দলের নেতা নাগরাজ বলছেন, ''রাজ্য সরকার কৃষকদের বঞ্চিত করছে।''

আসুন বারাণসীতে

উত্তরপ্রদেশে সি. পি. এম শিল্পের জন্য আবাসন প্রকল্পের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের এতটাই বিপ(ে যে, ২৯ অক্টোবর ভি পি সিংয়ের জনমোর্চার ডাকে বেনারসের রামলীলা ময়দানে দলের কেন্দ্রীয় নেতা সুহাসিনী আলি ও সুমিত চোপড়া জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। উর্বর কৃষিজমিতে হাইটেক সিটি গড়ার বিরোধিতায় এখানে কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দেহাত মোর্চা, রাণা সংগ্রাম সিং সংঘর্ষ সমিতি এবং ভি. পি. সিংয়ের জনমোর্চা।

বারাণসী জেলার সি. পি. এম সম্পাদক হীরালাল যাদব জানিয়েছেন, ''লোহটা - রোহনিয়ায় যে জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে সেখানে বছরে চারটি ফসল হয়। ধান, গম, ভুট্টা এবং আখ। তাছাড়া সারা বছর ধরে প্রচুর সবজির ফলন হয়। চাষের বাড়বাড়ন্ত এতটাই যে, করওতা, দাউদনগরের মতো গ্রামের যুবকদের কাজের জন্য বাইরে পা রাখতে হয় না। কোনও অবস্থাতেই এ জমি আমরা বিক্রি(করতে দেব না। এখানে শিল্প কিছুই হবে না। হবে আবাসন। চাষিদের মেরে এ কাজ আমরা হতে দেব না।'' [সূত্র দৈনিক স্টেট্সম্যান, ২২.৯.০৬] — এ যেন এক অন্য সিঙ্গুর। দিল্লীতে সি. পি. এমের কেন্দ্রীয় কমিটি পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমি অধিগ্রহণের প(ে রায় দিয়ে ২৯ তারিখে উত্তরপ্রদেশ চলেছেন কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিপ(ে জনসভা করতে। বুদ্ধদেববাবুর ভাষাতেই বলি — ''ঈ(ের ওদের (মা ক(ন। ওরা জানে না ওরা কি করছে।''

হরিয়ানায় সি. পি. এম কি বলছে শুনুন

১) কৃষিজমি দেওয়া চলবে না।

২) জমিহারাদের দিতে হবে উপযুক্ত((তিপূরণ।

৩) শিল্পের নামে জমি নিয়ে ঠিক কী হচ্ছে তা জানাতে হবে।

৪) সরকার জমি অধিগ্রহণ করলে দিতে হবে চাকরি।

৫) শহরকেন্দ্রিক এলাকায় নয়, শিল্প গড়তে হবে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে, অনুর্বর জমিতে।

৬) কোনও অবস্থাতেই জমি বিক্রি(র অধিকার দেওয়া যাবে না শিল্পপতিদের। জমি দিতে হবে লিজে।

হ্যাঁ, দৈনিক স্টেটস্ম্যানকে টেলিফোনে এই দাবি জানিয়েছেন সি. পি. এমের রাজ্য সম্পাদক ইন্দরজিৎ সিং। তিনি আরো জানিয়েছেন, ''আমরা আন্দোলন করেই সোনেপত জেলায় হরিয়ানার নগরোন্নয়ন দপ্তরের আবাসন প্রকল্পের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণ (খে দিয়েছি। তবে গুরগাঁও জেলায় সংগঠন তেমন ভালো না হওয়ায় অন্য বামদল সি. পি. আইকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছি।''

কেন্দ্রীয় আইন

এত দুঃখের মধ্যে একটা সোনালী রেখা। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এস. ই. জেড) নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে পথে আইন সংশোধন করতে চাইছে, তাতে কৃষিজমিতে শিল্প গড়ার পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী কমল নাথ জানিয়েছেন, 'কৃষি জমিতে শিল্প করা চলবে না। সংশোধিত আইনের খসড়ায় সে কথাই স্পষ্টভাবে লেখা থাকছে।' কমল নাথ রাজ্য সরকারগুলিকে ইতিমধ্যেই চিঠি লিখে মতামত চেয়েছেন। তারপর আইনের সংশোধন হবে।

সি. পি. এমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাটের নেতৃত্বে বাম দলগুলি যে নোট দিয়েছে, তাতেও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণ এড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বি(েনাথ প্রতাপ সিংহও একই দাবি তুলেছেন।

নৈনিতালে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনেই সোনিয়া গান্ধী জানিয়েছিলেন, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য উর্বর কৃষিজমি নেওয়া চলবে না। তবে একান্ত প্রয়োজনে উপযুক্ত((তিপূরণ দিয়ে জমি নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমানে যে আইন আছে তাতে কোনো বিধিনিষেধ নেই। পশ্চিমবঙ্গে শাসক পার্টি এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে চাইছে। নতুন আইন লাগু হবার আগেই জমি অধিগ্রহণ করে ফেলাটাই তাদের উদ্দেশ্য মনে হয়।

করণীয় কী, তা পরিষ্কার। সিঙ্গুর মার খেয়েও উদ্ধত। এ লড়াই সরকারের

মাইনে করা পুলিশ-র‍্যাফের লাঠিপেটাকে ভয় পায় না। মা-বোনেদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা যারা করেছিল, তাদের জবাব রক্ত(দিয়ে দিতে প্রস্তুত সিঙ্গুর। মানুষের দুর্বার লড়াই এখানে এক দিক-চিহ্নে(র সূচনা ক(ক।

তথ্যসূত্র

আজকের দেশব্রতী বিশেষ সংখ্যা ২৫ জানুয়ারি ২০০৬

আজকের দেশব্রতী পত্রিকা

নবান্ন শরৎ সংখ্যা ১৩১৪

দেশ ১৭ অগস্ট ২০০৬

দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান

আনন্দবাজার পত্রিকা

'পুঁজি' - প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় অংশ — কার্ল মার্কস

ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম — সুপ্রকাশ রায়

সিঙ্গুর নিয়ে তথ্যচিত্র - আ(োদি বুলাদি — ইমানুল হক

মার্কসবাদী পথ নভেম্বর ২০০৩ সংখ্যা

টাইম্‌স অব ইন্ডিয়া

এবং

সিঙ্গুরের কৃষকরা ও মায়েরা

সিঙ্গুর প্রথম পরিচয়ের গল্প

অরিন্দম সাহা সরদার

পুজোর আগে মধ্যরাত্রে পুলিশি আত্র(মণের আগেকার কথা ....

২৭ আগস্ট। সকাল ৮-৪৫-এ তারকে(শ্বর লোকালে আমরা, 'ফোকাস্'-এর আট জনের একটি আলোকচিত্রী দল, রওনা হই সিঙ্গুরের পথে। নানা পত্রপত্রিকা, টি.ভি. চ্যানেল এবং কয়েকজন পরিচিত মানুষজন সিঙ্গুর বিষয়ে আমাদের কৌতূহলী করে তুলেছিল। আমাদের মধ্যে এই নিয়ে তখন শু(হল নানা বিতর্ক। উঠে আসা অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অবশেষে আমরা ৯-৩০-এ কামারকুণ্ডু স্টেশনে। এখান থেকে একটি মা(তি ভ্যানে সোজা বাজেমেলিয়া। গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে চালক জানালেন যে গাড়ি এর বেশি যাবে না। অতএব যে-যার ক্যামেরা রেডি করে হাঁটা শু(করলাম ওই অপরিচিত গ্রামটির পথে।

চারদিক সবুজে সবুজ। পাখপাখালির ডাকে মুখরিত। কিছু(ণ হাঁটার পর দূরে কয়েকজনকে বসে থাকতে দেখলাম। মনে হল আমাদের উপস্থিতি ওদের ত্রস্ত করে তুললো।

ওদের কেউ কেউ উঠে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। আমরা নিজেদের পরিচয় দিলাম। বেশ কিছু(ণ ওদের আর আমাদের মধ্যে একটা প্রায়-অবিশ্বাসের পর্দা অনড় হয়ে ঝুলে রইল। ওরা অনেকেই আমাদের গ্রামের ভেতর যেতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করলেন। তখন আমরা কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না যে তাদের কথাই ঠিক ঠিক জানতে আমরা এসেছি। এরই মধ্যে আশপাশ থেকে অনেকে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছেন। তাদেরই একজন, অল্পবয়সী এক যুবক, হঠাৎই সামনে এগিয়ে এসে বলল যে — এরা টাটা-বুদ্ধ'র দালাল নয়, এটা যদি আমরা বুঝে থাকি, তবে এরা তো আমাদেরই লোক(তাহলে এদের ঢুকতে দিতে আপত্তি কোথায়! ওর এই কথায় সেই পর্দাটা নিমেষেই সরে গেল। আমরা সবাই ওর সঙ্গে রওনা দিলাম বাজেমেলিয়া ক্লাবের দিকে।

এখানেই গ্রামবাসীদের মিলিত প্রতিবাদের মুখে পড়েছিল টাটার লোকজনেরা, গত ২২ মে '০৬। ওদের গাড়ির গতি হয়েছিল (দ্ধ! সেই পথ ধরে হাঁটছি আমরা। এক এক করে ওখানকার অনেক অধিবাসী আমাদের সঙ্গী হলেন। মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠতে লাগলো — রক্ত(দেব, জমি দেব না!

হঠাৎ পিছন থেকে নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনে দাঁড়াতে হল। এক ভদ্রমহিলা, কোলে একটা বাচ্চাকে নিয়ে ছুটে আসছেন আমাদের দিকে। আমাদের সঙ্গী ছেলেটি আমাকে বলল — এই দিদি সব মিটিং মিছিল এমনকি বি(োভের দিনেও ছিলেন প্রথম সারিতে!

ভদ্রমহিলা আমাদের সামনে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন — 'আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো, রক্ত(দেবো, তবু জমি দেবো না।' বলে কোলের শিশুটিকে দেখিয়ে তিনি জানালেন — 'জমি আমাদের সন্তান, একে আমরা কিছুতেই ছাড়বো না!' এরপর উনিও মিললেন আমাদের পরিত্র(মায়।

বি(েজিৎদা, অপূর্বদা, প্রদীপদা এরা সবাই দেখলাম গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তায় মগ্ন। ওদিকে প্রদীপ, ঋষিতা, জয়তু, সোনিয়া দা(ণ উৎসাহে অবজারভেশনে ব্যস্ত। আমি সঙ্গী ছেলেটিকে নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে একজন বৃদ্ধ মানুষের ইন্টারভিউ নেবার তোড়জোড় করছি — হঠাৎ একটা ধাক্কা! ছেলেটিই হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। একটু ঘাবড়ে গিয়েই চেয়ে দেখি এক মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা কাস্তে নিয়ে আমাকে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন! ঠিক সময় ছেলেটি তৎপর না হলে ....! ওই ভদ্রমহিলা, সেই গাড়ি থেকে নামার পরই, আমাদের সমানে ল(্য করছিলেন। সুন্দর পোশাকআশাক, হাতে দামী ক্যামেরা, এসব তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে হয়তো তাঁর চোখে আমাদের ভদ্রবেশী প্রতারক বলে চিহ্নি(ত করছিল! দেখে শুনে মনের ভেতর আলোড়ন উঠছিল — কিছু একটা করতে হবে, করতেই হয়। সত্যি, সব কিছু আমরা যে কত দূর থেকে দেখি! এক এক করে অনেকের ইন্টারভিউ নেয়া হল। যে জমিতে কারখানা হবার কথা হচ্ছে তার ছবি তুললাম। 'মিডিয়া' নামের রঙিন উত্তরীয়টা এবার পুরোপুরি শরীর থেকে খসে পড়ল। নিজের চোখ দিয়ে দেখে এলাম কিভাবে সবুজে সবুজ চারফসলি জমি 'একফসলি' বলে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে! দেখে এলাম কিভাবে এখানের ভাড়া খাটানো জমির শহুরে মালিকদের নামের সঙ্গে, যারা জমি বেচে দিতে পারলে বেঁচে যায়, আর সব কৃষক মানুষদের নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে! দেখলাম, চাকরি বা মোটা টাকার (তিপূরণ, কোনোটাই তেভাগার ঐতিহ্যবাহী জেলার এই গ্রামটির মানুষকে আজ আর বিভ্রান্ত করতে পারছে না।

ওঁরা বলছেন সরকার তো প্রতি পরিবারের একজনকে চাকরি দেবে বলছে! যাদের ঘরে চারটি ভাই, তাদের পরিবার, বাবা-মা, তাদের ঘরের আর সব লোকেরা কি করবে?

মেয়েরা বলছেন আমাদের স্বামীরা পড়ালেখা জানে না। ওরা কী চাকরি করবে? সব মিথ্যে কথা। এখন এসব বলছে, জমি নিয়ে নিলে আর এ-মুখো হবে না।

ওঁরা আরও বলছেন টাকা দেবে। কত টাকা দেবে? টাকা দিয়ে কী হবে? টাকা তো একদিন না একদিন শেষ হবে। জমি থাকলে সেই জমিই পু(ষানুত্র(মে টাকা জোগাবে।

ওরা জানেন, রাজারহাট থেকে শু(করে কলিঙ্গনগর — জমি-জীবন আজ কিভাবে রাহুর গ্রাসে চলে যাচ্ছে!

বিকেল চারটে। আমরা এবার ফিরবো। ওঁরা আমাদের মুড়ি বাতাসা আর লেবু জল খাওয়ালেন।

আমাদের গাড়ি গ্রাম ছেড়ে স্টেশনের দিকে ছুটে চলেছে। চালককে অনুরোধ করলাম ভাই, একটু ধীরে চালাও। বাইরেটা কী সুন্দর সবুজ!

বড়লোকেরা ইট কাঠ পাথর ঘেরা শহরে এখন আর থাকতে চাইছেন না। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ চাই তাঁদের। মাটির মানুষদের আর মাঠি আঁকড়ে টিকে থাকতে দেয়া হবে না! তাই আজ সবুজ নিলামে চড়ছে সারা দেশে, সারা দুনিয়ায়। 'নিলাম' মানে আরো দাম, আরো আরো লাভ, ত্র(মশ আকাশচুম্বী। ...

উন্নয়নের নামে

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

অনুবাদ **আশীষ লাহিড়ী**

সিঙ্গুরকে ঘিরে যে-বিতর্ক দানা বেঁধেছে, তা কখনোই উন্নয়নের রূপ কী হওয়া উচিত তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়নি। তারই অনিবার্য পরিণাম আজকের এই পরিস্থিতি। মূল প্র্নোটা এ নয় যে একটা জমি একফসলি না দোফসলি। **মূল প্র্নোটা হল রাষ্ট্রশক্তি(কে, জনগণের স্বার্থকে, বি্ন-পুঁজির কাছে বাঁধা রাখা হচ্ছে কিনা**।

আজ সিঙ্গুরে যা দেখছি সেটা আমাদের বেছে-নেওয়া উন্নয়ন-পথেরই অনিবার্য ত্রি(য়াকৌশল। এ উন্নয়নের ব্যয় যৌথ রূপ নেয়, কিন্তু সুযোগসুবিধাগুলো ব্যক্তি(র কু(গত হয়। টাটাদের মোটর গাড়ি-ইউনিট তৈরির বিপুল ব্যয় বহন করছে প্রায় ১০০০ চাষী, বিরাট সংখ্যক (সংখ্যাটা ঠিক কত, তা বলা মুশকিল) ভূমিহীন খেতমজুর এবং রাষ্ট্র — যা কিনা টাটাদের ভরতুকি দিচ্ছে। অথচ, ঐ কারখানা থেকে সুযোগ-সুবিধে যা পাওয়া যাবে তার এক নগণ্য অংশই এদের হাতে পৌঁছবে।

সম্পূর্ণ স্বয়ংত্রি(য় একটি আধুনিক কারখানায় বিপুল সংখ্যক লোক চাকরি পাবে, এটা আশা করা যায় না। তা সত্ত্বেও দাবি করা হচ্ছে যে ১০,০০০ লোক নাকি চাকরি পাবে। যদি তাই হয়, তাহলেও এর মধ্যে অ-দ(শ্রমিকদের কাজগুলোই কেবল স্থানীয় লোকেরা পাবে। তার মানে, চিরকাল ধরে কৃষিকাজে অভ্যস্ত ও দ(হয়ে ওঠার পর এই মানুষগুলো ঐ মোটর গাড়ি কারখানার শ্রমবাহিনীর একেবারে তলার বর্গে স্থান পাবে — যদি আদৌ পায়।

দ(তার প্র্নে একটা ন্যায্য প্রতিযোগিতার কথা ভাবা যেতে পারে। ধরা যাক কয়েকজন শহর-জাত কম্পিউটর এনজিনিয়ারকে বলা হল চাষ করে জীবিকা অর্জন করতে। কজন পারবেন? অনুরূপভাবে, ২০০৮ সালে বা যখনই হোক, ''জনগণের মোটর গাড়ি'' যখন গড়গড়িয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন উৎখাত-হওয়া ক'জন স্থানীয় লোক সেগুলো চালাতে পারবেন? অথচ কারখানার সঙ্গে সং(-ষ্ট শিল্পগত ঝুঁকিগুলোর বেশির ভাগই তো বহন করতে হবে ঐ স্থানীয় মানুষদেরই।

একদিকে, অর্থনীতির উদারীকরণ রাষ্ট্রকে বলছে হাত গুটিয়ে নিতে, অন্যদিকে সেই রাষ্ট্রই (মতাশালীদের উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় ভরতুকি দিয়ে চলেছে। সুস্থ বাজারি প্রত্রি(য়া অনুযায়ী টাটাদের তো উচিত ছিল ন্যায্য বাজার-দরে প্রয়োজনীয় জমি কেনা। আশ্চর্যের ব্যাপার, তা কিন্তু তারা করেনি।

পশ্চিমবঙ্গে সব মিলিয়ে ৪৩,০২৮ একর বা তারও বেশি জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সিঙ্গুরের ১০০০ একর কৃষি-জমি তো তার এক ভগ্নাংশ মাত্র। বিরোধীদের সামনে

এর বাস্তবোচিত কোনো বিকল্প নেই। কাজেই তাঁরা এইসব জন-বিরোধী প্রত্রি(য়াগুলোকে প্রত্যাখ্যানের নামে যা করছেন তার মধ্যে আন্তরিকতা নেই, আছে কেবল রাজনৈতিক চালবাজি। ''আমরা শিল্পায়ন চাই, কিন্তু উর্বরা কৃষিজমিকে বিকিয়ে দিয়ে নয়'' — এই হচ্ছে বিরোধীদের জনপ্রিয় স্লোগান। কিন্তু এই যে উন্নয়নের খেলা, এখানে তো পছন্দমতো বেছে নেবার কোনো সুযোগ নেই। এখানে উন্নয়নের গোটা ডালিটাই হয় আপনি নেবেন, নাহয় গোটা ডালিটাই ফেলে দেবেন — মাঝামাঝি কিছু নেই। উন্নয়নের এই বি্ন-ছকে ব্যাপক মাত্রায় উৎখাত ঘটবে (বিশেষ করে আমাদের মতো জনবহুল দেশে), বাস্তুসাম্য তছনছ হয়ে যাবে, বহু জনগোষ্ঠীর সর্বনাশ হয়ে যাবে, বহুলোক (মতা হারাবে, বহু লোক হতদরিদ্র হয়ে পড়বে(কারণ এই উন্নয়নের ব্যয়টাকে অন্যের ওপর চাপাতে হবে যে। সবকিছুকে তা এক ছাঁচে তো ঢেলে দেবেই, উপরন্তু কম কষ্টকর অন্য কোনো বিকল্প সন্ধানের রাস্তাটাও বন্ধ করে দেবে।

এর ফলে অনিবার্যভাবেই জেগে উঠবে হিংসা, কেননা সামাজিক আর সাংস্কৃতিক বনেদটা অবধারিতভাবেই নষ্ট হয়ে যাবে। ভারতের মতো সমৃদ্ধ ও বহুবিচিত্র সংস্কৃতির দেশে তো কথাটা আরো সত্যি।

সিঙ্গুর খুব পরিষ্কার করেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, কোনো রাজনৈতিক দলই গ্রামের জনসাধারণের সত্যিকারের আশাআকাঙ্(ার প্রতিনিধিত্ব করে না — সি পি আই (এম) তো নয়ই। বাংলার গ্রামাঞ্চলে নানা রকম প্রাক্-পুঁজিবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সজীব রয়েছে। সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে আজ যে-প্রতিরোধ জেগে উঠেছে, তার অনেকটার পিছনে ঐসব বৈশিষ্ট্যই সত্রি(য় রয়েছে। জমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা তো নিছক অর্থনৈতিক নয়। তা শুধুই চুক্তি(মূলক এক সম্পর্ক নয়, তা গ্রথিত হয়ে রয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক এক কাঠামোর মধ্যে। চাষের জমি হারানো মানে শুধুই জীবিকা হারানো নয়। ঐ জমির সূত্র ধরেই মানুষ সমস্যা সামাল দেবার নানারকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কায়দাকানুন বার করে। চাষের জমি চলে যাওয়ার অর্থ হল, মহাজন আর ফড়েদের কবলে পড়া, যারা প্রাক্-পুঁজিবাদী আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংযোগস্থলে কাজ করে চলে।

তিক্ত(পরিহাসের ব্যাপার এই যে আজকের সরকারি শাসনপ্রত্রি(য়ায় ঔপনিবেশিক অনেক কিছুই দিব্যি বেঁচেবর্তে রয়েছে। নইলে জমি অধিগ্রহণ সংত্র(ান্ত ১৮৯৪ সালের এক বস্তাপচা আইনকে এমন অবলীলায় প্রয়োগ করা হল কী করে! দেশ শাসনের পরিপ্রে(িত এত বদলে গেছে, কিন্তু রাষ্ট্র এখনো ঐ শতবর্ষ আগের আইনেই স্বচ্ছন্দ বোধ করছে।

'পিপ্‌ল্‌স ডেমোত্র(াসি'-র ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ সংখ্যায় প্রকাশ কারাট 'পশ্চিমবঙ্গ জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনে'র সংশোধনী অনুমোদন করে বলেন, এর উদ্দেশ্য হল কলকাতার আশেপাশে বন্ধ হয়ে-থাকা কারখানাগুলোতে আটকে-থাকা ৪১,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা। ***বহুফসলি জমি অধিগ্রহণ করা আদৌ ঐ সংশোধনীর ল(্য ছিল না।*** জনগণ এখনও জানে না, ঐ ৪১,০০০ একর জমি কীভাবে কাজে লাগানো হবে, এবং কেন বহুফসলি জমি অধিগ্রহণ *না-করার* ঐ সিদ্ধান্তকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া হল।

উন্নয়নের এই যে-মডেলটা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে গেলানো হচ্ছে, অনেক উন্নত দেশ কিন্তু ত্র(মে ত্র(মে তা বর্জন করছে। সেসব দেশে ধোঁয়া-বেরোনো চিমনি আজ আর

সমৃদ্ধির প্রতীক নয়, প্রদূষণের প্রতীক বলে গণ্য। রাসায়নিক প্রক্রি(য়ায় তৈরি এবং জিন-বদলানো খাদ্য ফেলে দিয়ে আজ ডবল দাম দিয়ে লোকে জৈব খাবার কিনছে। বড়ো বড়ো বাঁধগুলোকে আজ ভেঙে ফেলার কথা হচ্ছে। পরিবেশ-সচেতনতা আজ উঠতি প্রজেক্টের মানুষের কাছে অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে বি(োয়নের ফলাফল নিয়ে অস্বস্তি ক্র(মেই প্রবল হচ্ছে। স্পষ্টতই, এই উন্নয়ন-ছকের সুবিধাগুলি আদৌ সকলের মধ্যে বণ্টিত হবে না, অথচ সেইসব সুবিধার মূল্য দিতে হবে তাদেরই যারা তা থেকে বঞ্চিত।

উন্নয়ন ব্যাপারটা নিয়ে নতুন করে ভাবা দরকার। তার এমন একটা নতুন সংজ্ঞা ঠিক করা দরকার যা একটা গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাবে। অন্যথায় এ উন্নয়ন মানুষকে সভ্য করতে গিয়ে ভয়াবহ অত্যাচার ডেকে আনবে, এ ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।

The Statesman, 27 October, 2006 থেকে সং(পিত ও অনূদিত। বস্টনে কর্মরত এই লেখক পেশায় ইলেকট্রিক্যাল এনজিনিয়ার। তিনি 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ইন্ডিয়াজ ডেভেলপমেন্ট' নামক সংস্থার স্বেচ্ছাকর্মী।

সিঙ্গুরের ইতিহাস

আত্মসমর্পণের নয়, সংগ্রামের

সৌমেন নাগ

ইতিহাসকে (মতার দম্ভে অনেকেই নিজের আজ্ঞাবহ দাসের ভূমিকায় খাঁচায় পুরে রাখতে চাইছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ইতিহাসের শি(া হল আমরা ইতিহাস থেকে শি(া নিতে চাই না, ইতিহাসের যে অংশটা মনঃপূত হয় না তা ইতিহাস থেকেই মুছে দেওয়াটা যেন নিরাপদ ভেবে এগোবার চেষ্টা করি। পৃথিবীর সব স্বৈরতান্ত্রিক শাসকই তো ইতিহাসকে এইভাবে আপন মর্জি-মতন তৈরি অথবা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। ইতিহাস কিন্তু তাদের ইতিহাসের আবর্জনায় নি(েপ করেছে(যাদের ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তাদেরই যে ইতিহাস তার আলোয় আলোকিত করেছে। স্পার্টাকাসকে হত্যা করে ইতিহাস থেকে মোছার চেষ্টা হলেও ইতিহাস কিন্তু স্পার্টাকাসকেই জায়গা করে দিয়েছে। যীশু ক্রু(শ-বিদ্ধ হয়েছেন বটে, ইতিহাস তার হত্যাকারীর ইতিহাস হয় নি। ইতিহাস হয়েছে যীশুর ইতিহাস।

হুগলি জেলার সিঙ্গুরের ইতিহাস টাটার সিঙ্গুরের ইতিহাস নয়। এর ইতিহাস কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস। টাটার শিল্পমৃগয়ার অনেক আগেই সিঙ্গুর তার কৃষক আন্দোলনের দীপ্তিতে ইতিহাসে যে জায়গা করে নিয়েছিল তাকে মুছে ফেলার জন্য বড্ড তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন বাম-কমরেডরা। আর তা করতে গিয়ে নিজের পরিচয়ের ইতিহাসটাকেই অস্বীকার করতে বসেছেন তাঁরা। কারণ ৪০-এর দশকের সেই কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হয়েছিল সংগ্রামী কৃষক শহিদের রক্তে(র আলপনা দিয়ে। আর সেই সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিল সেদিনকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

একটা প্র(ো অবশ্য উঁকি দিতে পারে। ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার পেছনে আজকের নব্য কমিউনিস্টদের অজ্ঞতা, নাকি জ্ঞানপাপীর মতন সেই ইতিহাসকে ঢেকে রাখার চেষ্টা—কোন্‌টা প্রধান ভূমিকা পালন করতে চাইছে? আজকের কমরেডদের হয়ত জানাই নেই কার্তিক ও গুইরামের নামসহ সিঙ্গুরের পাঁচ কৃষক রমণীর কথা। এঁরা যেদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে জমির অধিকার র(ার লড়াইতে শহিদ হয়েছিলেন সেদিন আজকের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিতান্ত কিশোর। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দলে এখনও তো অনেক প্রবীণ ব্যক্তি(আছেন, তাঁদের তো সিঙ্গুরের সেই সাত শহিদের রক্তে(ভেজা ইতিহাসকে এত সহজে ভুলে যাওয়ার কথা ছিল না। সেদিনকার সেই শহিদদের রক্তে(র বিনিময়ে গড়া পথ ধরেই আজকের এই মহাকরণ দখল করা সম্ভব হয়েছিল, একথা বিবেকের দরজায় কোনো এক একান্ত মুহূর্তেও তো খোঁচা দেওয়ার কথা। কারণ স্মৃতি যে বড় নিষ্ঠুর, বিশেষ করে সেই স্মৃতি যদি হয় বি(োসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার আবরণে ঢাকা।

তাই বোধহয় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা মাঝে মধ্যে কৃষিজমি থেকে কৃষকদের এই উচ্ছেদের ঘটনায় সেই কৃষক শহিদদের স্মৃতির ভারে প্রতিবাদের সুরে কথা বলে ওঠেন। তাই বলে প্রতিবাদী হয়ে (মতার সুখের ঘর থেকে বিতাড়িত হবার ঝুঁকি নেবেন, ঘোর কলিযুগে এমন আশা করা ঠিক নয়।

সিঙ্গুরের ইতিহাস ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী ইতিহাস। নেতৃত্বে ছিল সেদিনকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। শহিদের শবকে সিঁড়ি বানিয়ে লালবাড়ির (মতার ঘরে পৌঁছে গিয়ে সেই শহিদদের কথা ভুলে গেলেও তাদের উত্তরপু(ষদের রক্ত(প্রবাহে সেদিনকার কমিউনিস্ট নেতৃত্বে উদাত্ত আহ্বান এখনো যে তাদের সংগ্রামী মঞ্চে টেনে আনে। এটাই যে ইতিহাসের গতি। পূর্বপু(ষদের ডাককে যে অস্বীকার করা যায় না। আজকে সিঙ্গুরের যে কৃষকরা জমির অধিকার র(ার দাবিতে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছে, তাদের রক্তে(ও যে বইছে পূর্বপু(ষদের ডাক — 'জান কবুল আর মান কবুল/আর দেব না আর দেব না /রক্তে(বোনা ধান, মোদের প্রাণ হো।'

কবি হলে বা 'দুঃসময়' রচনা করলে ইতিহাসকে জানার প্রয়োজন নেই, এটা কিন্তু ঠিক নয়। মুখ্যমন্ত্রী একবার চেয়ে নিন না তাঁর পুলিশ দপ্তরের ফাইল। সিঙ্গুরের সেই রক্ত(াক্ত(সংগ্রামী ইতিহাস তাঁর সামনে হাজির হবে। বুঝতে পারবেন, সিঙ্গুরের কৃষকের এই বেয়াড়াপনা বিদ্রোহের উৎস কোথায়।

সিঙ্গুর থানার বুড়াকমলাপুরেই দানা বেঁধেছিল হুগলি জেলার কৃষক সমিতি। এখানকার জমিদার যোগেন সিঙ্গির দখলে ছিল ইউনিয়ান বোর্ড। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে সকলকে অবাক করে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত কৃষক সমিতি দখল করে নেয় বোর্ডের অধিকাংশ আসন। জমিদার বাজার থেকে যে তোলা তুলত, কৃষক সমিতি তার বি(দ্ধে গড়ে তোলে প্রতিরোধ।

১৯৪৯। স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন কিরণশঙ্কর রায়। এখানকার কৃষক সমিতিকে ভাঙতে সিঙ্গুরে পাঠিয়েছিলেন পুলিশ বাহিনী। বুড়াকমলাপুরে অভিযান চালিয়ে কৃষক সমিতির সদস্য এই অপরাধে শত্রুঘ্ন গড়ানকে গ্রেপ্তার করে রাস্তা দিয়ে অমানুষিকভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশের এই নির্মমতার বি(দ্ধে কার্তিক ও গুইরাম প্রতিবাদ করেছিলেন। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালে কার্তিক ও গুইরাম ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিলেন। উত্তাল প্রতিবাদকে মোকাবিলা করতে সমগ্র এলাকায় কার্ফু জারি করে মিলিটারি পাহারায় কৃষক সমিতির সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

হুগলীর ভুবির ভেড়ি অঞ্চল এর থেকে কয়েক কদম দূরে। ১৯৪৬ সালেই তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ এখানে আছড়ে পড়েছিল।

১৯৪৯। কৃষক সমিতির কর্মী সভা চলছিল একটি ঘরে। বিজয় বক্সী নামে এক জোতদার তার দোনালা বন্দুক নিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে শাসাতে শু(করেছিল — এখানে কৃষক সমিতির সভা করা চলবে না। কর্মীরা এই শাসানির প্রতিবাদে তার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে ভেঙে দিয়ে ফেরত দিয়েছিল। বিজয় বক্সী কোন্ অধিকারে বন্দুক নিয়ে শাসাতে এসেছিল সেই অভিযোগকে কোনো আমল না দিয়ে কৃষক সমিতির সদস্যরা কেন

তার বন্দুক ভেঙে দিয়েছিল, সেই অভিযোগে অর্জুন ধাড়া, আশু ভুঁইয়া-সহ বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৪৯-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি। বিশাল পুলিশ বাহিনী কৃষক সমিতিকে নির্মূল করতে সমগ্র এলাকাকে ঘিরে নিয়ে কৃষক সমিতির সদস্যদের গ্রেপ্তার করতে এসেছিল। গ্রামের মেয়েরা সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে পুলিশের গতিরোধ করে। পুলিশের প্রতি নির্দেশ ছিল যেভাবেই হোক কৃষক সমিতিকে নির্মূল করতে হবে, হোক না সামনের সারিতে দাঁড়ানো প্রতিরোধকারী কৃষক রমণী। পুলিশের হাতের অস্ত্র থেকে তপ্ত সিসা নি(িপ্ত হতে তাই হাত কাঁপেনি। পুলিশের গুলিতে একে একে মাটিতে নিথর হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন, মুক্ত(কেশী মাঝি, চণ্ডীবালা পাখিরা, পুষ্পবালা মাঝি, পাচুবালা ভৌমিক ও দাদীবালা পাল। আহতদের সংখ্যা অনেক। তবু কিন্তু সেদিন পুলিশ বাহিনীকে ঢুকতে দেয় নি আজকের সিঙ্গুরের পূর্বসূরিরা।

১৯৪৯ থেকে ২০০৬। আজ থেকে ৫৭ বছর আগে যে শিশুটি সেদিন সিঙ্গুরের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বা(দের গন্ধে মায়ের আঁতুর ঘরে, সে-ই শহীদ মায়ের লালরক্তে(রঞ্জিত সেই লাল কাপড়টাকেই মুক্তি(র ঝাণ্ডা বানিয়ে আজকের লাল কমরেডদের কিরণশঙ্কর রায়দের পরিবর্তে লালবাড়ির সিংহ দরজা দিয়ে ঢোকার পথ করে দিয়েছিল। তাদের সেখান সেই ঘোষণা — 'হেই সামালো ধান হো/কাস্তেটা দাও শান হো' গাইতে গাইতে পরম নিশ্চিন্তে জমিতে, রোপণ করেছিল ধান। ধানের শীষে আদরে হাত বুলিয়ে নিরাপত্তার উষ(উত্তাপের ঘ্রাণ নিয়ে চলেছিল। জেনে এসেছিল জোতদার ও পুঁজিপতিরাজ উচ্ছেদে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দলকেই তারা (মতার আসনে বসিয়ে এসেছে।

আজ সেই লাল বাবুরা (ুধিত পাষাণের মেহের আলির মতন 'সব ঝুট হ্যায়' বললেও সিঙ্গুরের কৃষকেরা তাদের পূর্বপু(ষদের রক্ত(দানে গড়া ইতিহাসকে 'ঝুট' বলে মানতে পারছে না। বি(্রস্ততার মোহভঙ্গ হয়ে এখন লালবাবুরা তাদের কাছে অচেনা যেন। যে লালবাবুরা সেদিন বলেছিলেন, লাঙল যার জমি তার, তারাই যে এখন বলছেন — এ জমি টাটার, এ জমি সালেমের, এ জমি আম্বানির। জমিদারের নায়েবরা যেমন বলত — জমিদার তোদের মা-বাপ, তাঁর যখন তোর জমিটা পছন্দ হয়েছে, তো জমিদারের পায়ে দিয়ে আয়, তিনিই তোদের দেখবেন। এখানে এখন লালবাবুরা বলছেন — জমি দাও, টাটারা মা-বাপ, তাঁরাই তোমাদের দেখবেন। কেমন দেখবেন? কৃষকেরা কাজ পাবেন মালি, চৌকিদার অথবা ঝাড়ুদারের। তাদের ঘরের বউরা কাজ পাবে বাবুর বাড়ির পরিচারিকার বা রাঁধুনির।

সিঙ্গুরের মানুষ এসব বুঝেছেন। তাই সাতান্ন বছর আগের ইতিহাস এখন কথা বলতে চাইছে।

স্বা(রিত প্রতিবাদপত্র ১, ২, ৩

☐ প্রতিবাদপত্র ১

বিষয় সিঙ্গুরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী
মাননীয় রাজ্যপাল,
পশ্চিমবঙ্গ,
রাজভবন, কলকাতা-৭০০ ০০১

বিষয় সিঙ্গুরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

মাননীয়েষু,

আমরা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বি(্বিবিদ্যালয়ের শি(করা, যারা এই পত্রে স্বা(র করেছি, তারা সিঙ্গুরে প. বঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক প্রায় ১ হাজার একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের ঘটনাটিতে আমাদের গভীর মানসিক উদ্বেগ ও আপত্তি জানাচ্ছি। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ল(্য করে আমরা সবিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করছি

১। যে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তা বহুফসলি ও পর্যাপ্ত জলসেচিত। তাই এ জাতীয় সুব্যবস্থিত কৃষিজমি হারালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস হবে ও তার পরিনামে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যে দারিদ্র বৃদ্ধি পাবে।

২। জমিতে প্রস্তাবিত গাড়ি-কারখানার ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে কোনো 'মূল্য-কল্যাণ' (Cost-benefit) বি(-ষণ অদ্যাবধি করা হয়নি।

৩। যে বিপুল কৃষক জনগোষ্ঠী, যার সংখ্যা বহু সহস্র, যাঁদের এই জমি জীবিকা, খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছে, তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। পরিবর্তে উচ্চপর্যায়ের যন্ত্রচালিত একটি গাড়ি-কারখানাতে বড় জোর কয়েক শত চাকরি/কাজের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে যাতে এইসব অদ(, বাস্তুহারা কৃষকেরা নিযুক্ত(হতে পারবেন না।

৪। পু(লিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলার অনুর্বর, ((অঞ্চলে এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার বন্ধ কল-কারখানার জমিতে শিল্পায়নের জন্য স্থান পাওয়া যেত। যদি সরকার বাস্তবিকই শিল্পায়ন সম্পর্কে ঐকান্তিক হতেন তাহলে সম্ভাবনাময় কৃষি-অর্থনীতিকে বিনষ্ট না করে (উন্নতি দূরস্থান) এবং উর্বর জমি থেকে মানুষকে উচ্ছেদ না করে বরং এইসব বিকল্প সুযোগগুলি বিবেচনা করতেন।

৫। সিঙ্গুরের এবং অন্যান্য স্থানের বি(ভরত কৃষক-পরিবারগুলির ওপর রাজ্যযন্ত্রের বর্বর আত্র(মণ যা মানবিক অধিকার ভঙ্গ করেছে তা আমাদের বিহ্বল ও আহত করেছে।

উপরিলিখিত বক্ত(ব্যের পরিপ্রে(তে আমরা আপনাকে বিশেষ অনুরোধ করছি এই ব্যাপারটি অনুসন্ধান ও বিবেচনা করার জন্য এবং সরকারকে তার জনবিরোধী ও উন্নয়ন বিরোধী কার্যত্র(ম থেকে বিরত করার জন্য।

স্বা(রকারী — বিভিন্ন বি(্বিবিদ্যালয় ও শি(া-প্রতিষ্ঠানের ১৩০ জন।

☐ প্রতিবাদপত্র ২

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল সমীপে,
রাজভবন, কলকাতা।

বিষয় জমি ও কৃষকদের ওপর এই অগণতান্ত্রিক আগ্রাসনের বি(দ্ধে (খে দাঁড়ান!

প্রিয় মহাশয়,

সিঙ্গুরে কৃষকদের বহুফসলি জমির ন্যায্য অধিকার থেকে উৎখাত করে তাদের জীবিকা উপার্জন ব্যাহত করার যে-বন্দোবস্ত করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমরা সে সম্পর্কে আমাদের গু(তর দুশ্চিন্তা ব্যক্ত(করছি। আমরা মনে করি এই ব্যবস্থা সিঙ্গুরের স্থানীয় কৃষকদের, এবং সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মঙ্গল সাধন করবে না।

মানুষকে তার জীবিকা উপার্জনের ন্যায্য ও আইনসম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কোনো সরকারেরই উচিত নয়, বিশেষত যেখানে সরকার থেকে এমন কোনো আ(্বাসই দেওয়া হয়নি যে (তিগ্রস্ত মানুষদের, অথবা ঐ কৃষকদের ওপর যারা নির্ভরশীল তাদের সকলকে টাটাদের প্রস্তাবিত ছোটো-গাড়ি প্রকল্পে কর্মচারী হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আমাদের ধারণা সেটা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আমরা সরকারকে সমর্থন করার এমন কোনো অকাট্য কারণই খুঁজে পাচ্ছি না যার জোরে এই জমি অধিগ্রহণকে যুক্তি(যুক্ত(বলা যেতে পারে। তাছাড়া, আমরা মনে করি, যদি-বা কোনো জমি-মালিক সরকারি চাপের কাছে কিংবা (তিপূরণ দানের প্রস্তাবের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি হয়, তার ফলে উক্ত(কোম্পানি গড়ে তোলার জন্য বহুফসলি জমির যে-সর্বনাশ ঘটবে তাকে মেনে নেওয়া যেতে পারে না।

আমরা শিল্পায়নের সমর্থক, কিন্তু বহুফসলি জমির ও কৃষকদের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে শিল্পায়ন আমরা চাই না। আমরা মনে করি, উপযুক্ত(পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব। তার ভিত্তি হল জমির ফসল সংগ্রহ করে ভরতুকি-হারে সেই ফসলের বণ্টন। এটা করলে কৃষক, ছোটো জমি-মালিক আর দিনমজুর সকলেরই ত্র(য়(মতা বাড়বে, যার ফলে তারা স্থানীয় অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে, ফলত তলা থেকে উন্নয়ন ঘটানোর পথ পরিষ্কার হবে। এটা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত যে বহু-প্রচারিত 'বি(্বায়ন' (!) আসলে একটি সাম্রাজ্যবাদী ছক। বি(্বের বাকি অংশের স্বার্থের মূল্যে উন্নত দেশগুলো এবং একশ্রেণীর হঠাৎ-নবাব ছাড়া আর কেউই এর দ্বারা লাভবান হবে না। অপরিকল্পিত, দায়িত্বজ্ঞানহীন শিল্পায়ন, সিঙ্গুরে যা ঘটতে চলেছে, তা একটি পুরাপ্রস্তরযুগীয়

উদ্যোগ (চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব)। যে-অর্থনৈতিক বৈষম্য ইতিমধ্যেই ব্যাপক, তাকে যথেচ্ছভাবে ব্যাপকতর করে তুলবে এই উদ্যোগ। এটা সংবিধানের অন্তর্নিহিত সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের বিরোধী।

সিঙ্গুরে বর্তমানের এই দেশ-বিরোধী, আগ্রাসী স্বৈরতান্ত্রিক বন্দোবস্তের বিরোধিতা করছি আমরা।

স্বা(রকারী ৯১৯ জন, ১০ নভেম্বর '০৬ পর্যন্ত।

ইন্টারনেটে সম্প্রচারিত এই প্রতিবাদের মূল উদ্যোক্ত(া

অভী কুমার দত্ত-মজুমদার, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স,

বিধাননগর, কলকাতা। ই মেইল abhec.dm@saha.ac.in

□ প্রতিবাদপত্র ৩

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য,

টাটা কর্পোরেশনের একটি কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হুগলি জেলার সিঙ্গুরে ১২৫৩ একর উর্বর জমি থেকে ছোটো ছোটো কৃষক ও অনান্য খাদ্য-উৎপাদকদের উৎখাত করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, এই খবর আমাকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে।

আমি অবহিত যে সিঙ্গুরে ঐ বহুফসলি জমিতে সিঙ্গুরের মানুষের বহু পু(ষের বাস। ঐ জমি থেকে বছরে ৮০০০ থেকে ৯০০০ টন চাল, গম, পাট ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। এর সুবাদে ঐ অঞ্চলের মানুষ খেয়ে-পরে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে।

সরকার কর্তৃক জনগণের এই উর্বর ও উৎপাদনশীল জমি অধিগ্রহণ করার চিত্রটি বড়ো ভয়াবহ। জমিই তাদের জীবন। জমি কেড়ে নেওয়ার অর্থ হল তাদের মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচবার অধিকার কেড়ে নেওয়া। এর ফলে খাদ্য ও জীবিকা উপার্জনের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

তাছাড়া সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রত্রি(য়ায় কোনো স্বচ্ছতা নেই, নেই কোনো আন্তরিক গোষ্ঠী-অংশগ্রহণের ছবি। জমি-মালিককে (তিপূরণের যে-ডালি দেওয়ার কথা হচ্ছে তা জমির প্রকৃত মূল্যের তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। তার ওপর, অর্থনৈতিক পুনর্বাসনেরও কোনো পরিকল্পনা নেই। হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষিমজুর আর বর্গাদারের জীবন এইসব জমির ওপর নির্ভরশীল। এদের দেওয়ার জন্য কোনো (তিপূরণের ডালি নেই। সবচেয়ে (তিগ্রস্ত হবে মেয়েরা, কেননা জমির স্বত্ব তাদের নামে লেখা নেই, ফলে তারা কোনো (তিপূরণই পাবে না। এর ফলে ঐ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল বুভু(া জেগে উঠবে। এ বুভু(া ঠেকাতেই হবে।

জনগোষ্ঠীগুলির স্বার্থ এবং তাদের খাদ্য-সার্বভৌমত্বকে তুলে ধরার দায় নিতেই হবে পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে। জমি ও জীবনের ওপর জনগোষ্ঠীর অধিকারকে টাটাদের মতো সংস্থার নিজস্ব স্বার্থের ওপরে ঠাঁই দিতেই হবে সরকারকে।

জনগণের প্রকৃত খাদ্য-সার্বভৌমত্বের এক চিন্তিত প্রবক্ত(া হিসেবে আমি আপনার পদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি, আপনি সিঙ্গুরের মানুষের জীবন-জীবিকাকে সম্মান ও র(া ক(ন এবং

১) সিঙ্গুরের চাষীরা যাতে জমিতে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে তার ব্যবস্থা ক(ন।

২) জমি রেখে দেওয়ার ব্যাপারে জনগোষ্ঠীসমাজ যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে মর্যাদা দিন, জনগোষ্ঠীর অধীনে কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা করার যে-আওয়াজ তাঁরা তুলেছেন তার প্রতি মনোযোগ দিন।

৩) যতদিন না জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে যথার্থ অংশগ্রহণমূলক এবং স্বচ্ছ কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রত্রি(য়া কাজে প্রযুক্ত(হচ্ছে, যতদিন না জমির যথোপযুক্ত(ও ন্যায্য (তিপূরণের বন্দোবস্ত হচ্ছে, যতদিন না সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্বসতি ও পুনর্বাসনের প্রত্রি(য়া ঠিকঠাক চালু হচ্ছে, ততদিন জোর জবরদস্তি করে, সহিংস উপায়ে জমি থেকে উৎখাত করা বন্ধ ক(ন।

৪) টাটাদের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য অ-কৃষি জমিতে অন্য বাস্তবসাধ্য বিকল্পের সন্ধান ক(ন।

সিঙ্গুর জেলার কৃষক আর জনগোষ্ঠীগুলিকে অনর্থক অন্যায়ভাবে জমি থেকে উৎখাত করার এই কাজ বন্ধ হোক, এই আমার দাবি।

আপনার একান্ত,

স্বা(রকারী ১৫৩৬ জন, ১০ নভেম্বর '০৬ পর্যন্ত।

ইন্টারনেটে সম্প্রচারিত এই পত্রের উদ্যোক্ত(া 'পিপল্‌স্ কোয়ালিশন অন ফুড সভারেইন্‌টি (PCFS), পেনাং, মালয়েশিয়া। ই-মেইল secretariat@foodsov.org

প্রতিলিপি ১. জাস্টিস শ্যামলকুমার সেন
চেয়ারপারসন, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন
ভবানী ভবন, আলিপুর, কলকাতা ২৭

২. মি. জাঁ জাইগলার
UN Special Rapporteur on the Right to Food
জেনেভা, সুইজারল্যান্ড